প্রাচীন জগৎ

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a History Text Book for Class VI vide Notification No TB VI/H 79 96 dated 5. 12. 79 and also Board's Letter No SYLL/PN/1/79 dated 8, 1. 79

প্রাচীন জগৎ

(ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাস)

গিরীন চক্রবর্তী এম. এ. বি. টি.
সহকারী প্রধান শিক্ষক, মডার্ন স্কুল
কলিকাতা

S. BANERJEE & CO.
5, RAMANATH MAZUMDER ST.
CALCUTTA — 9

BAMA PUSTAKALAYA
11A, COLLEGE SQUARE
CALCUTTA — 12

প্রকাশক : শ্রীসুধীরচন্দ্র ব্যানার্জী
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

[বর্তমান সংস্করণ ভারত সরকার প্রদত্ত
স্বল্প মূল্যের কাগজে ছাপা হইল]

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর—১৯৭৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারী ১৯৮০

পাঁচ টাকা কুড়ি পয়সা মাত্র
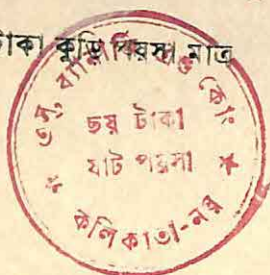
মুদ্রাকর : শ্রীনীরদ চৌধুরী,
জাগরণী প্রেস
৪০/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা-১২

ভূমিকা

মধ্য-শিক্ষা পর্ষদের পাঠক্রম অনুযায়ী "প্রাচীন জগৎ" লেখা হল। এর আগেও এই নামেই ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য বই ছিল। তবে সে পাঠক্রম থেকে এবারের পাঠক্রম আরও অনেক সুসংহত হয়েছে। আদি মানুষের উদ্ভব থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত প্রাচীনযুগের ইতিহাস গল্পচ্ছলে বলার চেষ্টা করেছি। কতদূর সফল হয়েছি তার বিচার হবে শিক্ষক শিক্ষিকাদের দিয়ে। সহৃদয় সতীর্থদের কাছে বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন প্রয়োজনীয় স্থলে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়ে গ্রন্থটির উন্নতি বিধানে সাহায্য করেন।

১২ই জুন, ১৯৭৯
কলিকাতা

বিনীত
গিরীন চক্রবর্তী

HISTORY SYLLABUS

CLASS—VI

HISTORY OF ANCIENT CIVILISATIONS

A. (i) Why we should read history ; (to be acquianted with human civilisation, its development) (ii) How we come to know of ancient people.

B. Early man.—Use of fire as early as 300,000 B. C. (by 'Peking Man') : Food gathering man.

Old Stone Age—Nature of tools and implements, their uses. New Stone Age—(By 8000 B. C.). Evolution of tools and implements. Man—a food producer.

The Neo lithic revolution consisted also of domestication of animals : invention of pottery (wheel) ; weaving (clothings) ; dwelling—stone houses with defences ; early transport beginnings of community life in settlements ; beliefs and arts (as evident from cave-paintings etc.) ; use of formal language as a means of communication ; worship of the Goddess of productivity.

C. Copper-Bronze Age—Emergence of towns ; changes in production—specialisation (various types of skill of artisans and craftsmen) ; commerce (exchange of commodities) ; some changes in social life—classes ; inter-tribal conflicts ; emergence of an early form of state. Reasons of the growth of River-Valley Civilisations.

D. The Early Civilisations—(3000 B. C.—1500 B. C.)—Mesopotamia, Egypt, Indus Valley, China—in outlines :

(i) Mesopotamia—(a) Location and antiquity ; earlier development of civilisation than in other areas. (b) Fertility of the soil,—crops. (c) Defence against floods. (d) Other occupations. (e) Achievements of Sumerians : imposing towers, mud-brick temples, fresco, stone-cutting, metallurgy, transport and trade, script.

(ii) Egypt—(a) Location and nature of the land ; (b) The Pharaoh, the priest, script and scribes, tax collectors and 'soldiers' (workers) ; (c) Trade ; (d) The Pyramids (examples) ; (e) Religious beliefs ; (f) Chief occupations.

(iii) The Indus Valley—(a) The discoveries (brief reference to locations and findings) ; (b) Town planning ; (c) Food and other articles of use ; (d) Crafts ; (e) Trade ; (f) Worship ; (g) Light thrown by relics upon classification in society.

(iv) China—(a) Valley of Huang Ho and Yangste-Kiang ; (b) China in early times ; (c) Myths (particularly of flood).

(v) Common features, in brief, of the riparian civilisations with special reference to social and economic life.

E. The Iron Age-Societies—(a) Discovery and uses of iron, its impact ; (b) Main features of social and economic life ; (c) Growth of Kingship.

I. (i) Babylon—Farming and Commerce ; Temples and Priests ; Learning and culture ; The code of Hamurabi—nature of society revealed by the Code. (ii) Egypt as an Imperial power—colonies ; The power of priests (iii) Iran—Rise of Persia ; Zoroaster (iv) The Jews—Hebrews in Egypt ; Hebrew exodus under Moses—flight from slavery.

II. GREECE (only in broad outlines)—An introductory note on the influence of Crete : The Homeric Age. The city state, cultural interchange, colonisation. Athens and Sparta—their social and political life. Athens Vs. Sparta. Cultural greatness of Athens ; Literature, Arts, Religion—brief reference to a few eminent persons e.g. Pericles, Sophocles, Socrates, Herodotus, Macedon : Alexander—his invasion of India. Fall of Empire. Roman conquest of Greece.

III. ROME—Origin of Rome. Conflict with Carthage. Early Roman Society : Particians and Plebeians, Roman citizenship, Slavery and slave revolts (Spartacus). Julius Caesar : End of Roman Republic. New Empire. Eventual decline and fall. Rise of Christianity.

IV. CHINA—"Great Shang". Confucious—his teachings. Building the Great Wall. The China Empire.

V. INDIA—(a) The coming of Aryans. (b) The Vedas. (c) Early Aryans Society, religion, and political organisation (with reference to the Vedas). (d) The Epics (e) The rise of Jainism and Buddhism. (f) The Empires—a brief outline of development from the Mauryas – to the Khusans —to the decline of the Gupta Empire. (g) Ancient Bengal upto the decline of the Guptas (on the basis of proven historical materials viz. inscriptions and literary evidence). (h) Foreign contacts (particularly with Central Asia,)—their impact upon society and trade ; (i) Foreign Travellers—Megasthenes and Fa Hien.—general picture of society as revealed in their accounts (in brief outlines only). (j) A brief summary of ancient Indian developments in arts and architecture, literature education (Taxila and Nalanda), and Sciences (Astronomy, Mathematics, Chemistry, Medicine).

সূচীপত্র

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

চতুর্থ পরিচ্ছেদ :

পঞ্চম পরিচ্ছেদ :

লৌহযুগের সমাজ

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাবিলন

অতীতের সন্ধানে

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

কেন ইতিহাস পড়ব?

হয়ত অনেক সময় তোমাদের মনে হয়েছে, "ইতিহাস পড়ব কেন?" এর উত্তর হল—ইতিহাস পড়া হচ্ছে অতীতকে জানবার একটা পথ। আমাদের পূর্বপুরুষদের অতীত জীবনের ঘটনা আর কাহিনী নিয়েই তো ইতিহাস।

উন্নত জীবন আর সুন্দর সুশৃঙ্খল সমাজের জীবনধারাকে বলে সভ্যতা। পৃথিবীতে নানা যুগে নানা সভ্যতা দেখা দিয়েছে। তাদের কোনটা ধ্বংস হয়েছে, আবার কয়েকটি এখনও টিকে আছে। আমরা ইতিহাস পড়ি এইসব সভ্যতা কেমন করে গড়ে উঠল, তাদের কাছ থেকে আমাদের কি শিখবার আছে, তা জানবার জন্য।

আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের। সকল যুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক, কিংবা সমুদ্রগুপ্ত, শশাঙ্ক, আকবরের মত রাজা-বাদশাহ কিভাবে এদেশ শাসন করেছেন, কি শিক্ষা দিয়েছেন আমাদের তা লেখা আছে ইতিহাসে।

ইতিহাস পড়লে আমরা দেখতে পাবো অতীতে আমরা কত বড় ছিলাম। তখন আমরা দেশকে আরও ভালবাসতে শিখবো। শুধু দেশের কথা নয়। পৃথিবীর অন্য নানা দেশের শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতার কথাও জানতে পারব। তখন সারা পৃথিবীর মানুষকেই ভালবাসতে শিখবো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচীনকালের কথা জানলাম কেমন করে ?

ইতিহাস পড়ে না হয় জানবো অতীতকালের পূর্বপুরুষদের কাহিনী। কিন্তু সেই প্রাচীন যুগের লোকের কথা জানবার উপায় কি ?

আমাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস অনেক, অনেক প্রাচীন। সে ইতিহাসের আরম্ভ দশলক্ষ বছর আগে। অত দিন আগের ইতিহাস কেউ লিখে রাখে নি। লিখে রাখবে কে ? মানুষ তো তখন সবে চার পা থেকে দুপায়ে থপ্‌থপ্‌ করে হাঁটতে শিখ্‌ছে।

সেই অতীতের ইতিহাসের সূত্র কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষেরাই রেখে গেছেন। তাঁদের হাতের কাজ, মাটির বাসন, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি খুঁজে বের করে আমরা সে যুগের জীবনযাত্রার বিষয় জান্‌তে পারি। হাজার হাজার বছর মাটির তলায় বা ইতস্তত ছড়িয়ে থাকলেও এগুলো কঠিন বলে এখনও টিকে আছে। একদল বিজ্ঞানী আছেন যাঁদের কাজ হল পুরাকালের এইসব হারিয়ে যাওয়া

ইতিহাসের সূত্র আবিষ্কার করা। তাঁদের বলে **পুরাতাত্ত্বিক** বা **প্রত্নতাত্ত্বিক**।

পুরাতাত্ত্বিকদের যোগাড় করা সাক্ষ্য প্রমাণ থেকেই হাজার, হাজার কি লক্ষ লক্ষ বছর আগের ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। পুরাতত্ত্ব কথাটার অর্থ হল পুরাকালের নানা কিছুর ধ্বংসাবশেষ নিয়ে গবেষণা করা। স্মৃতিস্তম্ভ, দালানকোঠা, মুদ্রা, মৃৎপাত্র, পাথর বা ধাতুর তৈরী যন্ত্রপাতি, মূর্তি, প্রতিমা, আরও অজস্র জিনিস যা অতীত যুগের মানুষ ব্যবহার করতেন তা নিয়ে আলোচনাই হল পুরাতত্ত্বের কাজ। কোনও প্রাচীন শহর কি গ্রাম ধ্বংস হয়ে মাটির নীচে চাপা পড়ে গেছে। পুরাতাত্ত্বিকেরা এসব খুঁড়ে অনেক প্রাচীন শহর আবিষ্কার করেছেন। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে কেমন
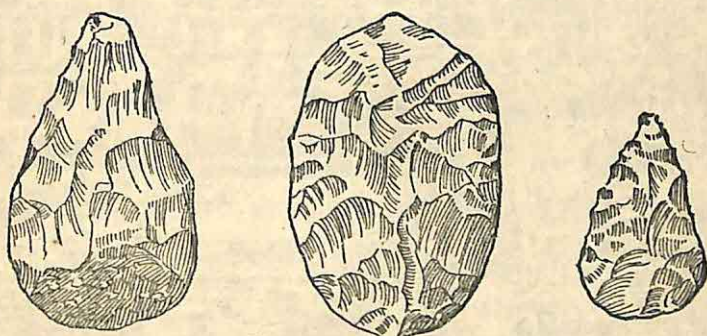
পুরাকালের অস্ত্রশস্ত্রের নিদর্শন

করে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর দয়ারাম সাহানী মহেঞ্জোদড়ো আর হরপ্পা আবিষ্কার করেছিলেন। এই ভাবেই মিশরীয়, সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, কি আসিরীয় সভ্যতাও পুরাতাত্ত্বিকরাই আবিষ্কার করেছেন।

পুরাতত্ত্ব থেকে আমরা সুদূর অতীতের কথা জেনেছি। আর নিকট অতীতের কথা আমরা লিখিত ছাপানো নজীর থেকে জানতে পারি। যখন ছাপার যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি তখন হাতে লেখা পুঁথিপত্রে ইতিহাসের কথা জানা যায়। আরও আগে যখন

কাগজ আবিষ্কার হয়নি, তখন তালপাতায়, কি মিশরের পাপিরাস নামে নলখাগড়ার উপর, কি ভূর্জপত্রে, কি চামড়ার ওপর, নয়ত তামার পাতে ইতিহাসের কাহিনী লেখা থাকত। কখনো বিজয়স্তম্ভ, শিলালিপি, পাহাড়ের পাথরের উপর, নয়ত মাটির পাতের উপরেও লেখা হত। সম্রাট অশোকের ইতিহাস জানা গেছে সারা ভারতের এদিক সেদিক ছড়িয়ে থাকা বহু শিলালিপি থেকে।
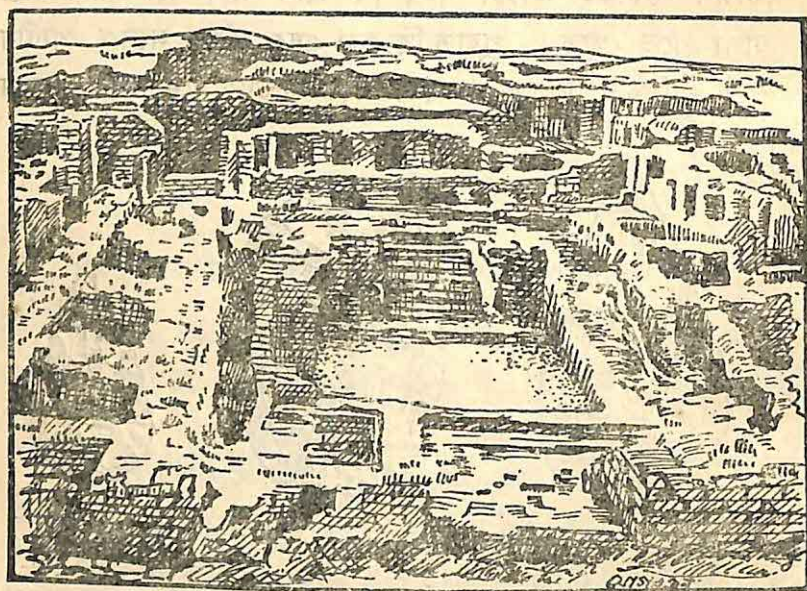
মহেঞ্জোদড়োর স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ

এইসব সূত্র নিয়ে পুরাতাত্ত্বিকদের মতো **নৃতত্ত্ববিদ** নামে আর একদল বিজ্ঞানীও অতীতের ইতিহাস লেখায় সাহায্য করেন। সুতরাং আমরা প্রাচীন কালের লোকের কথা জানতে পারি পুরাতাত্ত্বিক আর নৃতত্ত্ববিদ্‌দের আলোচনা, গবেষণা আর আবিষ্কার এবং এসবের উপর ভিত্তি করে রচিত ইতিহাস থেকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

খাবার যোগাড়ে পূর্বপুরুষ

আমাদের পূর্বপুরুষদের খোঁজে যদি অতীতে চলে যাও তাহলে অবাক হয়ে দেখবে যে সেই একেবারে আদিকালের মানুষ মোটেই আমাদের মত দেখতে ছিল না। বন মানুষের মতই তাদের থপ্ থপ্ করে চলা, তাদেরই মত গায়ে লোম, আর তাদের মত ঘাড় কুঁজো ও তাদেরই মত উলঙ্গ। সে পূর্বপুরুষদের সবচেয়ে প্রথমে দেখা গিয়েছিল মধ্য আফ্রিকায়। সে দশলক্ষ বছর আগের কথা।

তারা তখনো সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখেনি। যে বানর-মানুষ প্রথম অনেকটা সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখেছিল তাদের দেখা পাওয়া যায় দক্ষিণ এশিয়ায় জাভা দ্বীপে। তাদের বলা হত **জাভা মানুষ**। সে পাঁচ লক্ষ বছর আগের কথা। পাঁচ লক্ষ থেকে দু' লক্ষ বছরের মধ্যে চীনে আর একটু উন্নত মানুষ দেখা গিয়েছিল।

খাবার যোগাড়ে জীবন ঃ আফ্রিকার বানর-মানুষদের একটা অংশ পাঁচ লক্ষ বছর আগে গদা আর পাথরের হাতিয়ার তৈরী করতে শিখেছিল। সেদিন থেকে প্রকৃতির উপর তাদের নির্ভরতা কমল। জাভা ও চীনের মানুষও ঐ সময় গদা আর পাথরের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার শিখেছিল। গাছের ফলমূল কুড়িয়ে, পোকা-মাকর ধরে

এরা খেত। পশুপাখী শিকার করলে তার মাংস এরা কাঁচাই খেত। কেননা তারা তখনো সিদ্ধ করতে জানত না। নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করতে এরা তখনো শেখেনি। কয়েকজন পুরুষ, মেয়েমানুষ, আর শিশুদের নিয়ে এক একটা দল এক এক জায়গায় থাকত। একা একা বের হলে হিংস্র পশুদের ভয় ছিল। তাই সেই বানর-মানুষের দল বেঁধে মিলেমিশে থাকত। তাদের জীবন ছিল অত্যন্ত কষ্টের।

পিকিং মানুষ

আগুন আবিষ্কার : সেই আদি বানর-মানুষদের ভয় ছিল দুটো জিনিসের। প্রথম আবহাওয়া আর দ্বিতীয় হিংস্র জীবজন্তু। তবে

জীব জন্তুদের হাত থেকে বাঁচার শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল আগুন। মানুষ আগুন আবিষ্কার করল হঠাৎ। গ্রীষ্মে গাছের শুকনো ডালে ডালে ঘষা লেগে আগুন জ্বলে উঠে। হয়ত কোনও বুদ্ধিমান লোক সেই জ্বলন্ত ডালপালা গুহায় এনে আগুন জ্বালিয়ে রাখল। আবার দুটো চক্‌মকি পাথরের ঘষা থেকে হয়ত হঠাৎ আগুনের ফুলকি বেরিয়ে শুকনো পাতায় আগুন ধরিয়ে দিল। তারা অমনি আগুনকে নানা কাজে লাগালো। মানুষ এরপর থেকে কাঁচা মাংস না খেয়ে আগুনে পুরিয়ে খেতে লাগল। আর আগুনের আলোয় বসে তারা কাজকর্মও করতে শিখল।

আগুন আবিষ্কারের কৃতিত্ব কিন্তু চীনের মানুষের। আজ থেকে তিন লক্ষ বছর আগে চীনের বানর-মানুষ তাদের গুহায় আগুন জমিয়ে রাখতে শিখেছিল। সে হচ্ছে চীনের রাজধানী পিকিং-এর কাছে চো-কো তিয়েন নামে এক গুহা। পিকিং-এর কাছে এই মানুষের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে এদের নাম হয়েছে পিকিং-মানুষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পুরাপ্রস্তর যুগ

যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জামের ধরণ ও ব্যবহার

যখন থেকে মানুষ পাথর ভেঙ্গে দরকার মত জিনিসপত্র আর সরঞ্জাম তৈরী করতে শিখল, তখন থেকে যে যুগের আরম্ভ—তাকে বলা হয় **প্রস্তরযুগ**। এর তিনটে বিভাগ—পুরা, মধ্য ও নবপ্রস্তর যুগ।

পুরাপ্রস্তর যুগের মানুষ প্রধানত ছিল "খাবার যোগাড়ে"। খাদ্যের জন্য তাকে প্রায় সম্পূর্ণই প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হত। পাথরের যেসব যন্ত্রপাতি সে বানাতে শিখেছিল তা দিয়ে মরা জন্তুর চামড়া ছাড়ানো, মাংস কাটা, হাড় ভাঙ্গা নানা কাজ চালাতো। হাজার হাজার বছর অভিজ্ঞতার পরে আদিম মানুষ শিখেছিল

কিভাবে ঠিক করে পাথর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে—ছাল ছাড়ানো হাড় ভাঙ্গা এই রকম বিশেষ বিশেষ কাজের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি বানাতে হয়। পুরাপ্রস্তর যুগের আবার তিনটি স্তর আছে। সেই তিনটি স্তরের যন্ত্রপাতির ধরনধারণ ও ব্যবহারও ভিন্ন ভিন্ন।

আদি পুরাপ্রস্তর যুগ : এযুগের যন্ত্রপাতি বলতে ছিল বড় পাথরের নুড়ি ভেঙ্গে একপাশে ধারালো দা-এর মত যন্ত্র (১নং)। নুড়ির দুধার
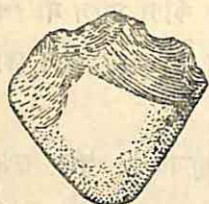
আদি পুরাপ্রস্তর যুগের সরঞ্জাম

ঠুকে ঠুকে ধার করে হাতে ধরা কুড়ুল, (২নং) যা দিয়ে প্রায় সব দরকারী কাজই করা যায়। বাটালির মত লম্বা ধারালো পাথরের যন্ত্র (৩নং) যা দিয়ে কোন কিছু চেরার কাজ চলে।

মধ্য পুরাপ্রস্তর যুগ : গর্ত করার ভোঁড় (৪নং), তীরের ফলা (৫নং), চাঁছার যন্ত্র (৬-৭ নং) ইত্যাদি।

মধ্য পুরাপ্রস্তর যুগের সরঞ্জাম

শেষ পুরাপ্রস্তর যুগ : ছুঁচলো আগা (৮নং) অর্ধচন্দ্রের মত ফলা (১০-১১নং) আর চাঁছার নানা যন্ত্রপাতি ও মাটি খোঁড়ার জিনিস (৯নং) মানুষ এই স্তরে তৈরী করত। তখন তারা যন্ত্রপাতি বানানোর জন্য দরকারী সরঞ্জামও বানাতে শেখে। জ্ঞান

বৃদ্ধির ফলে এখন তীর ধনুক আর বল্লম আবিষ্কার করা হয়েছিল।
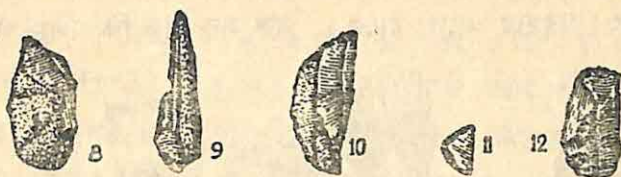
শেষ পুরাপ্রস্তর যুগের সরঞ্জাম

এই স্তরে বিশেষ নিপুণভাবে মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করতে শেখে। তার ফলে ঠিক এযুগের শেষেই মানুষ চাষবাস শিখেছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : প্রথম পাঠ

নব প্রস্তরযুগ (৮০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত)

নতুন নতুন যন্ত্রপাতি হল

মাঝারি প্রস্তর যুগ : পুরা প্রস্তরযুগের শেষ অধ্যায় থেকে নব প্রস্তরযুগের আরম্ভের মধ্যে মাঝারি প্রস্তরযুগ নামে আর একটি স্তর ছিল। সে যুগে যন্ত্রপাতি ছিল ক্ষুদ্রাকৃতি।

নব প্রস্তর যুগ : মধ্য প্রস্তরযুগের শেষে দেখা দেয় নব প্রস্তর যুগ। সে প্রায় আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে। আট হাজার খ্রীস্ট পূর্বাব্দের কথা। এযুগের অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম সব কিছু পুরা প্রস্তরযুগের তুলনায় উন্নত আর নতুন ছিল বলেই এ নাম হয়েছে। এযুগে কৃষি কাজ শেখায় মানুষের মাটি খোঁড়া, বনজঙ্গল সাফ করা, শস্য কাটার যন্ত্রপাতির দরকার হয়। সে অভাব মেটানোর জন্য মানুষ আবিষ্কার করে গর্ত খোঁড়ার জন্য কাঠের হাতলের মধ্যে রাখা লম্বা ছুঁচলো পাথরের ফলা। ফসল কাটার জন্য বানানো কাস্তে। বাঁকানো কাঠের মধ্যে ধারালো পাথরের ফলা বসিয়ে সে যন্ত্র তৈরী হল। তারপরে তৈরী হল কাঠের লম্বা হাতলের মাথায় বসানো মোটা পাথরের ফলা বসিয়ে কুড়ুল। কাস্তে আর কুড়ুল দেখতে এখানকার মতই ছিল। বন কেটে বসত করার কাজে লাগত এই কুড়ুল। শস্য পেষার জন্য উদুখল আর হামানদিস্তাও তখন আবিষ্কৃত হয়েছিল। শিকারের জন্য তীর ধনুক

বর্শা বল্লমের যেমন উন্নতি করা হয়, তেমন কোনও কোন অঞ্চলে গুলতিরও ব্যবহার হতে থাকে। সরু সরু হাড় কি শিঙ্ দিয়ে
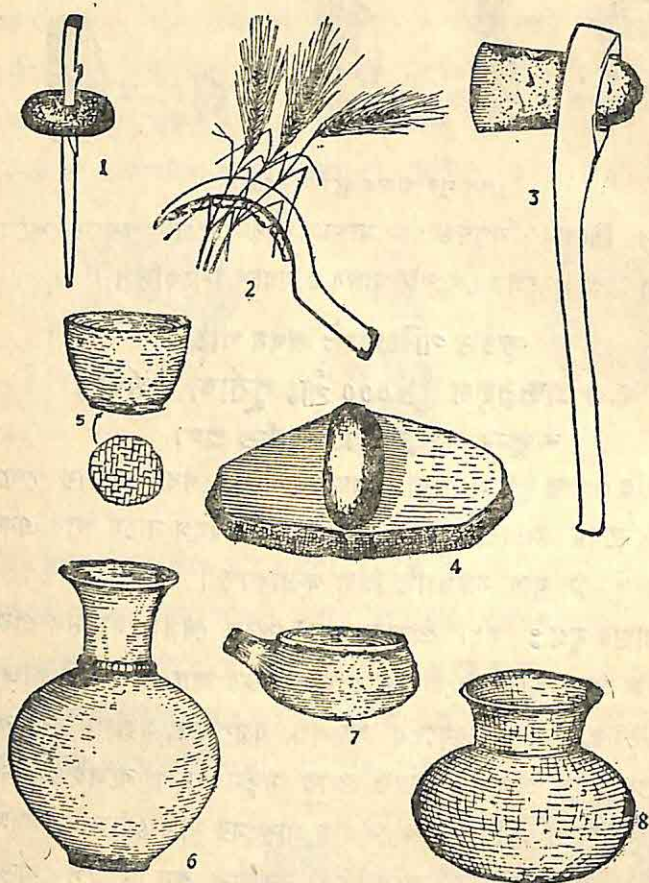
নবপ্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতি ও মৃৎপাত্র

নব প্রস্তরযুগের মানুষ ছুঁচ-ও মাছ মারার ট্যাটা বা হার্পুন তৈরী করত।

দ্বিতীয় পাঠ

মানুষ খাদ্য উৎপাদন শিখল

হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ তার চারপাশের জিনিসের বিষয় ভাল ভাবে জানতে পারল। ততই সে তার জীবনে আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় আবিষ্কার করতে লাগল। নব

প্রস্তরযুগের এসব নানা আবিষ্কারের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হল কৃষি-কাজের পদ্ধতি আবিষ্কার। এতকাল মানুষ জংলা গাছপালা থেকে খাদ্য আহরণ করেছে। কি করে যে গাছে খাদ্য ধরল তা বুঝবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। হয়ত কখনো কেউ লক্ষ্য করে থাকবে যে ফসল ঝাড়বার সময় গম বা যবের শিস্ থেকে যে-সব দানা ভূষির সঙ্গে মাটিতে মিশে থাকে কালক্রমে তা থেকে চারা গজিয়ে আবার ফসল ধরল। কি করে বীজ থেকে যে চারা হল তা নিশ্চয়ই সে যুগের মানুষকে খুব ভাল করে লক্ষ্য করতে হয়েছিল।

কৃষি আবিষ্কারের প্রথম যুগে মানুষ একই জমিতে গর্ত খুঁড়ে সব শস্যবীজ তাতে পুঁতে দিত। তারপর যখন কয়েক বছর পর সে জমিতে আর উর্ব্বরা শক্তি থাকত না, তখন তারা নতুন জমিতে চাষ করতে যেত। এই ভাবে চাষের পদ্ধতি ত্রিপুরা অঞ্চলে এখনো দেখা যায়। তাকে বলে জুম চাষ।

কৃষি কাজ আবিষ্কারের ফলে মানুষের যাযাবর জীবনের শেষ হল। মানুষ একই জায়গায় বাস করে নিজের খাদ্য উৎপাদন করতে শিখে ধীরে ধীরে স্থায়ী সমাজ জীবন গড়ে তুলল। নব প্রস্তরযুগের মানুষের জীবনেও এতে এল এক বিরাট পরিবর্তন। তাকে বলা **চলে নব প্রস্তরযুগের বিপ্লব**।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথম পাঠ

নব প্রস্তরযুগের বিপ্লব

পশুপালন—মৃৎপাত্র তৈয়ার—কাপড়বোনা

মানুষের জীবনে যখন সব দিক থেকে তাড়াতাড়ি বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয় তখন তাকে বলে বিপ্লব। আগের পাঠেই নব প্রস্তরযুগের বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে। তার কারণ এই যুগে যেমন মানুষ খাদ্য উৎপাদন করতে শিখে প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্তি পেল, তেমনি আরও নানা বিষয় আবিষ্কার করে পুরা প্রস্তরযুগের জীবনধারাই একেবারে বদলে দিল।

পশুপালন : জীবজন্তু শিকার করতে গিয়ে কখনো হয়ত সে যুগের মানুষ তাদের বাচ্চাদের বন্দী করে এনেছিল। কারও হয়ত মাথায় এল যে এদের একেবারে না মেরে লালন পালন করলে এদের দিয়ে নানা কাজ করানো যেতে পারে। তখন হয়ত কেউ পশুপালন আবিষ্কার করল। কুকুরই প্রথমে মানুষের পোষ মানে। পোষা কুকুর মানুষকে শিকারে সাহায্য করতে লাগল, ছাগল ভেড়া খেদানোরও কাজ করল। মানুষ জীবজন্তু পুষে নিজেদের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে নিল ; জীবনে আরও স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে এল।

মৃৎপাত্র আবিষ্কার : নব প্রস্তরযুগের আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হচ্ছে মৃৎপাত্র। মানুষ যখন শস্য বুনতে শিখল তখন থেকেই তার প্রয়োজন হল পাকা শস্য জমা করে রাখার পাত্র। জল ধরার জন্যও মাটির পাত্র তৈরী করা হত হাতে হাতে কাদা দিয়ে, নয়ত বাঁশের চাঙারির চারিপাশে মাটি লেপে দিয়ে। পরে আর চাঙারির দরকার হত না।

চাকা আবিষ্কার : এযুগের আর একটি যে বিশেষ উপকারী জিনিস আবিষ্কার হল, তার নাম চাকা। কে যে কেমন করে চাকা আবিষ্কার করল তা জানা যায় না। কিন্তু চাকা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই নব প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনধারার সাংঘাতিক পরিবর্তন হল। এখন সে গাড়ী করে অনেক দূরে সহজেই যাতায়াত করতে পারতো। চাকা আবিষ্কারের ফলে গাড়ীতে করে ভারী জিনিসপত্রও বহন করা সম্ভব হল। তাছাড়া এই চাকাই কুমোরের চাকের কাজে লাগল। তখন মাটির বাসনেরও অনেক উন্নতি হল।

কাপড়-চোপড় বোনা : মাছ ধরার জন্য মানুষ যেমন জাল বুনতে শিখেছিল, তেমনি ক্রমে ক্রমে কাপড়-চোপড়ও বুনতে শিখল। কলা বা অন্য আঁশওয়ালা গাছের বাকল জলে ভিজিয়ে আঁশগুলো ছাড়িয়ে বা পশুর চামড়া সরু সরু ফালি নয়ত লম্বা ঘাস উপরে নীচে জড়িয়ে আদিম মানুষ কাপড় বুনতো। এখন তুলা থেকে সূতা কেটে কাপড় তৈরী হল।

দ্বিতীয় পাঠ

ঘরবাড়ী—আদিম যানবাহন

ঘরবাড়ী বানানো ঃ নব প্রস্তরযুগের শেষের দিকে মানুষ যখন ভালভাবে চাষবাস, পশুপালন শিখল, উন্নত জিনিসপত্র বানাতে শিখল তখন তারা আর যাযাবর জীবন যাপন করত না। তারা উর্বর কৃষির জমি, পশুচারণের মত মাঠ, আর পানীয় জলের সুব্যবস্থা আছে এমন জায়গায় ঘর বেঁধে বসবাস আরম্ভ করল। আগে তো তাদের ঘরবাড়ী ছিল ডালপালার ওপরে লতাপাতা দিয়ে মোড়া, নয়ত পাহাড় পর্বতের গুহা-গহ্বর। এখন উন্নত ধরনের কুড়ুল তৈরী করায় কাঠের ও পাথরের ঘরবাড়ী বানানো আরম্ভ হল। হিংস্র পশুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে ঘন ঘন ঘরবাড়ী তৈরী করা ভাল। তাই তখনকার লোকেরা খুব কাছাকাছি ঘর তুলে বাস করত। কয়েকটি পরিবার ঐভাবে পাশাপাশি ঘর তুলে সে
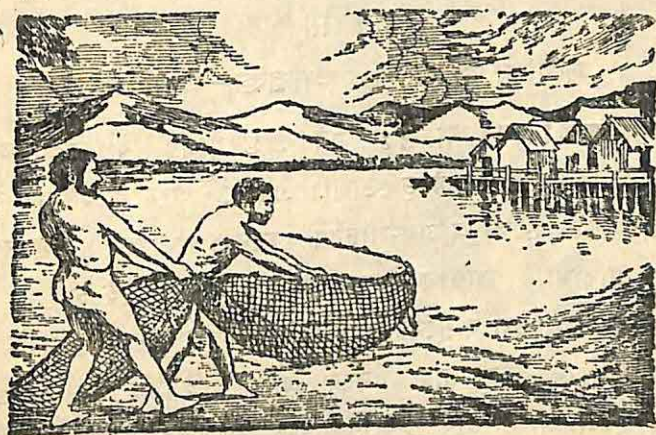
হ্রদবাসীর জীবন

ঘরবাড়ি ঘিরে কাদামাটি বা ডালপালা দিয়ে প্রাচীরের মত বেড়া বানাতো। এই বেড়ার বাইরে থাকত চাষের বা গোচারণ জমি। যেখানে পাথর পাওয়া সোজা ছিল সেখানে পাথরের দেওয়াল গেঁথে তার চারপাশে পাথরের বেড়ার প্রাচীর বানিয়ে আত্ম-রক্ষার ব্যবস্থা করা হত। যেসব মানুষ মাছ ধরে খেত, তাদের অনেকে হ্রদের

মধ্যে খুঁটি পুতে তার উপর ঘর বানাতো। এ ধরনের ঘরবাড়ির চিহ্ন-পাওয়া গেছে ইওরোপের সুইজারল্যাণ্ডের একটি হ্রদের মধ্যে।

আদিম যানবাহন: চাকা আবিষ্কার করার সময়েই তো বলা হয়েছে যে মানুষ তখন থেকে গাড়িতে করে যাতায়াত করত। মাল-পত্র বহনের জন্যও গাড়ি ব্যবহার চলত। সে গাড়ি গরু মোষে টানত। এমন গাড়ির নমুনাও পাওয়া গেছে। আজও তো এমন গাড়ী দেখা যায়। তাছাড়া ছিল জলপথে নৌকায় যাওয়া। তালগাছ কেটে শালতি করে তাতে তো এখনো মানুষ চলে। খাল বিলের দেশের মানুষ বর্ষার বড় বড় মাটির গামলায় অনায়াসে যাতায়াত করে থাকে। কলাগাছের ভেলা বানিয়ে আমরা এখনো খাল বিলে চলি। তেমনি আমাদের পূর্বপুরুষেরাও ঐ ধরনের নৌকায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে কিংবা দেশে বিদেশে যেত।

তৃতীয় পাঠ

সমাজ জীবনের আরম্ভ—ধর্মবিশ্বাস

সমাজ জীবনের আরম্ভ: নব প্রস্তরযুগের বিপ্লবের ফল হল মানুষের সমাজ জীবন গড়ে তোলা। একসঙ্গে অনেকে বসবাস করতে গেলেই কতকগুলো আচার-আচরণ মেনে চলতে হয়। পরস্পরের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি বন্ধ করতে হলেও তাই চাই। তখন পর্যন্ত গ্রামেই ছিল মানুষের বসতি। সেই গ্রামের মানুষেরই প্রথম কাজ হল কে কোন্ কাজ করবে আগে তাই ঠিক করা। গ্রামের কেউ গেল মাঠে চাষ করতে, কেউ গেল বনে জঙ্গলে শিকার করতে, নয়ত নদীতে মাছ ধরতে। অন্যেরা হয়ত পশুপালন করল, নয়ত যন্ত্রপাতি তৈরী করল। মেয়েদের মধ্যে সবাই ভাগাভাগি করে সূতো কাটত, কাপড় বুনত, রান্নাবান্না করত, নয়ত ছোট ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনা করত। কে কোন্ কাজ করবে তা ঠিক করে দেবার জন্য গ্রামের সবাই বসত আলোচনায়। তা হলেও এক একজনকে থাকতে হতো যার কথা সকলে শুনবে। গ্রামের মেয়ে

পুরুষের মধ্যে যার বয়স, বুদ্ধি আর বল বেশী তিনি সাধারণত নেতা হতেন।

ধর্মবিশ্বাস শিল্পকলা : মানুষ সভ্যতার পথে যত এগিয়েছে তত ভাবনা-চিন্তার অবসর পেয়েছে। তাদের মধ্যের চিন্তাশীল লোকেরা চারিপাশের প্রকৃতির ঘটনা দেখে বিস্ময় বোধ করেছে। তারা ভাবল গ্রামে যেমন একজনের নির্দেশে সকলে সব কাজ করে তেমনি নিশ্চয় আকাশেও কেউ আছে যার আদেশে চন্দ্র, সূর্য উদয় হয় আর অস্ত যায়। পৃথিবী মায়ের মত তাদের সকলকে খাওয়াচ্ছে। সুতরাং আকাশ দেবতা ও পৃথিবী দেবীকে পূজা করা দরকার। মানুষ শিকারের জীবজন্তুদের পূর্বপুরুষদের প্রতীক মনে করত। তারা ভাবত যেসব পশু তারা শিকার করেছে তারা যেন দয়া করে নিজেরা বলি হয়ে তাদের বংশধরদের খাওয়াচ্ছেন। ক্রমে ক্রমে এক এক গ্রামের মানুষের কাছে এক এক জীবের পূজা আরম্ভ হল।

নবপ্রস্তর যুগের শিল্পীরা আঁকছে

এই ভাবে সৃষ্টি হল ধর্মকর্ম। শিকার করতে গেলে তারা সেই জীবের মূর্তি গুহা-গহ্বরের গায়ে এঁকে তার সামনে নেচে নেচে শিকারের অভিনয় করত। এমন গুহার গায়ে আঁকা ছবি ভারতেও আছে। তবে সবচেয়ে বিখ্যাত হল স্পেনের আলতা-মিরা গুহার দেওয়ালে আঁকা বাইসনের জীবন্ত ছবি। ধর্মেরই অঙ্গ হিসাবে এল শিল্পকলা।
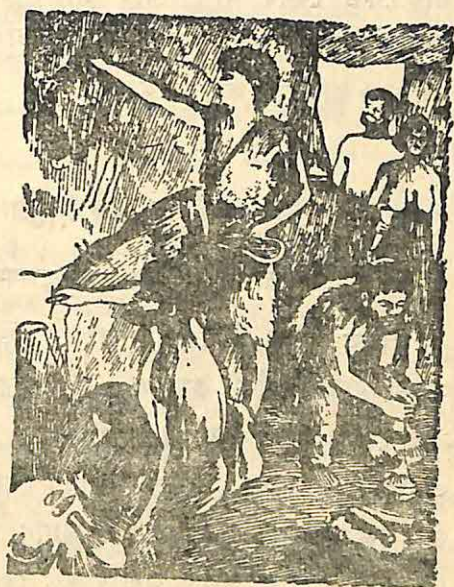
যখন দেবদেবীর সংখ্যা বেড়ে চলল—তখন আবার প্রকৃতির নানা ঘটনার ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিল। তখন একদল লোককে এই কাজেই লাগানো হল। তাঁরা ছিলেন অন্যের তুলনায় বেশী বুদ্ধিমান আর পণ্ডিত। এঁরাই পরে হলেন সমাজের পুরোহিত। আর যাদুমন্ত্রের পূজারী।
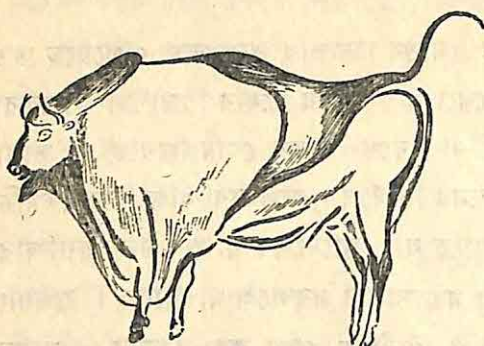
আলতামিরার বাইসন

মানুষ মরলে তার কি হয় এ চিন্তাও তাদের ছিল। মরে গেলে আর কেউ ফেরে না। মরে গেলে লোককে কবর দেওয়া হত। কবরের উপরে পাথরের চাকতি দিয়ে ঢাকা হত। মৃতের ব্যবহারের জিনিসও থাকতো কবরের মধ্যে।

চতুর্থ পাঠ

ভাষা শিক্ষা—মাতৃকাদেবী পূজা

মানুষ ভাষা শিখল : কাজের জিনিস, অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করে মানুষ নিজের খাটুনী কমালো। অবসর সময়ে সে খাবার যোগাড় করা ছেড়ে অন্য কাজ করতে লাগল। আমরা যাকে সংস্কৃতি বলি অর্থাৎ শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা তারই গোড়া পত্তন হল তখন। অন্য জীবজন্তু যা পারেনি মানুষ সেই অসাধ্য সাধন করল। দলের মধ্যে মিলে মিশে কাজ করতে করতে সৃষ্টি হল ভাষা। তখন ভঙ্গী ভাষাতে ভাব বিনিময় হত। তবে আমরা যে যুগের কথা বলছি তখনো মানুষ মনের কথা লিখে বুঝাতে পারত না। লিপি তখনো আবিষ্কার হয়নি। ভাষা শিখে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারল—আর নিজের শেখা কাজের অভিজ্ঞতা বংশ পরম্পরায়

ছোটদের শেখাতে পারতেন। নীচের ক্লাশে তোমরাও পড়েছ যে আর্যরা লিখতে জানতেন না। তাই তাঁরা মুখে মুখে যত বেদ রচনা করেছিলেন।

মাতৃকা দেবীর পূজা : এ সমাজে আগের যুগের শিকারী ও খাদ্য যোগাড়ে জীবনের কিছু সংগঠন টিকে ছিল। সেজন্য নব-প্রস্তর যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তার আগের সমাজের সামাজিক অনুষ্ঠান ও ধর্মচিন্তারও পরিবর্তন ঘটে। এই সব অনুষ্ঠানে মেয়েদের ভূমিকা বাড়ল আর শস্য উৎপাদনের বিষয়টার উপর জোর পড়ল। সে যুগের মানুষ শস্যের জন্ম রহস্য আবিষ্কার করতে পারেন নি। আর জমিতে কি করে ফসল ফলে তা দেখলেও তার কারণ জানতেন না। তাঁরা মনে করতেন মা থেকে যেমন শিশুর জন্ম হচ্ছে—শিশুরা যেমন মায়ের দুধ খেয়ে বাঁচে, তেমনি মাতা পৃথিবীও তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্য শস্য উৎপাদন করছেন। মাতার মত পৃথিবীরও উৎপাদিকা শক্তি আছে। উৎপাদিকা শক্তি বা উর্বরা শক্তিরও নিশ্চয় কোন দেবী আছেন। তাঁকেও পূজা করতে হবে। তিনিই মাতৃকা দেবী। তাই নিজ নিজ ধারণা মত মাটির ছোট বড় মাতৃকা মূর্তি গড়ে তাঁর পূজা আরম্ভ হল। আর সমাজে তখন মেয়েদের কাজ বেশী ছিল বলে তাঁদের ক্ষমতাও ছিল বেশী। তাঁদেরও যেন পূজা করা হল মাতৃকা মূর্তি পূজার মধ্য দিয়ে।

নবপ্রস্তর যুগের দুর্বলতা : নবপ্রস্তর যুগে নানা উন্নতি হলেও এ সমাজের মধ্যে কয়েকটি দুর্বলতা ছিল। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়ে সঙ্কট সৃষ্টি করল। নিত্য নতুন গ্রাম স্থাপনের আর জায়গা ছিল না। তাছাড়া তাদের উৎপাদন ব্যবস্থাও ছিল স্বনির্ভর ও অনুন্নত। নবপ্রস্তর যুগের সমাজের মধ্যে থেকে আর সঙ্কট এড়াবার উপায় ছিল না। তাই মানুষ গ্রামের জীবনের গণ্ডী কাটিয়ে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে এর সমাধান করেছিলেন। সেও ছিল এক বিপ্লব। আর সে বিপ্লবের হাতিয়ার ছিল ধাতু আবিষ্কার।

তাম্রব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পাঠ

গ্রাম ছেড়ে মানুষ শহরে এল

মানুষ ধাতু আবিষ্কার করলেন ঃ নবপ্রস্তর যুগের শেষে যখন মানুষ সভ্যতার পথে কিছুটা এগিয়েছেন তখন আর পাথরের অস্ত্রশস্ত্রে কাজ চলছিল না। এক ধরনের সবুজ পাথর আগুনে পুড়িয়ে তা থেকে বেশ চমৎকার চোখ ঝলসানো ধাতু বার করলেন। সে ধাতু **তামা**। পরে তামার সঙ্গে টিন বা সীসা মিশিয়ে তৈরী হল আরও শক্ত ধাতু **ব্রোঞ্জ**। মানুষ তামার সন্ধান পেয়ে প্রস্তর যুগ পেরিয়ে গেলেন। আরম্ভ হল তামা আর ব্রোঞ্জের যুগ—**তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ**।

নগরের পত্তন ঃ নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কারের সঙ্গে মানুষের সমাজে কাজের ধারারও পরিবর্তন হতে লাগল। নতুন নতুন অভাব দেখা দিল সমাজে। সে অভাব মেটাতে গিয়ে নতুন নতুন কাজ আরম্ভ করতে হল। অনেক ধরনের কাজের লোকও দেখা দিলেন। নানা লোক নানা কাজ করতে লাগলেন। তাঁদের কারিগর আর কারুশিল্পী

বলা হত। এঁদের সাহায্যে চাষবাসেরও উন্নতি হল; পশুপালন থেকেও লাভ বাড়ল। গ্রামের আকার বড় হল। আর সেই সঙ্গে দূর হল নবপ্রস্তর যুগের দুর্বলতা। কৃষকরা নিজেদের দরকারের চেয়ে বেশী খাবার জিনিস উৎপাদন করতে লাগলেন। সেই উদ্বৃত্ত খাদ্য বিনিময় করে তাঁরা তাঁতীদের কাছ থেকে পরিচ্ছদ, কুমোরদের কাছ থেকে মাটির বাসনকোসন বা স্যাকরার কাছ থেকে গায়ের গহনা বিনিময় করে আনতেন। এখন আর আগের মত একই পরিবারের সবাইকে সব কাজ করতে হত না। তাঁতী, কুমোর, ছুতোর এঁরাও নিজেদের তৈরী জিনিস লেনদেন করে অন্য সব প্রয়োজন মেটাতেন। এইভাবে যেমন যেমন বিনিময় বা বাণিজ্য বাড়তে লাগল তেমনি ভাবে গ্রামের কারিগর বা হস্তশিল্পীরা কাজের সুবিধার জন্য এক জায়গায় কাছাকাছি বসবাস আরম্ভ করলেন। তাঁদের ঘিরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল **নগর**।

বিশেষীকরণঃ নগর জীবনের প্রধান লক্ষ্য করার জিনিস হল যে এক এক পরিবারের লোক এক এক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। কামারের লাঙ্গল বা গাড়ী বানানো, কুমোরের ভাল ভাল মাটির বাসন বানানো কিংবা ধাতু গলিয়ে তা দিয়ে নানা জিনিসপত্র তৈরী করা সহজ কাজ নয়। সে দক্ষতা সব মানুষের থাকে না। এর জন্য বিশেষ শিক্ষা চাই। সেজন্য কারিগর আর কারুশিল্পীরা ক্রমে এক বিশিষ্ট শ্রেণীতে পরিণত হলেন। তাঁদের কাজের **বিশেষীকরণ** ঘটল। প্রত্যেকের কাজ বিশেষ ভাবে আলাদা হয়ে যাওয়াকে বিশেষীকরণ বলে। সে সমাজে যে মানুষ যে কাজে নিপুণতা লাভ করতেন তিনি ছেলে-পিলেদেরও সেই কাজ শেখাতেন। এইভাবে ছুতোরের ছেলে হতেন ছুতোর, কামারের ছেলে কামার, কুমোরের ছেলে কুমোর।

এই সময় এক বিরাট পরিবর্তন এল মানুষের জীবনে। মানুষ প্রয়োজনের চেয়ে উদ্বৃত্ত জিনিস উৎপাদন করতে আরম্ভ করলেন। সেই উদ্বৃত্ত জিনিস অন্যের সঙ্গে বিনিময় করে নিজ নিজ অভাব

মেটাতেন। কারও যদি কোন কাঠের জিনিস দরকার হত তিনি তখন ছুতোর মিস্ত্রীর সঙ্গে তাঁর নিজের উৎপন্ন বাড়তি খাদ্য কি অন্য কোনও জিনিস বদলাবদলি করতেন। এই ভাবে একটা জিনিসের বদলে অন্য জিনিস নেওয়াকে বলে **বিনিময়**। বিনিময় থেকেই কালক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্ভব হয়েছে।

অনেক দূর দেশ থেকে নানা জিনিস বিনিময় করে তামা আনতে হত। তারপর ব্রোঞ্জ আবিষ্কার হলে আরও দূরদেশ থেকে টিন বা সীসা এনে তামার সঙ্গে মিশিয়ে ব্রোঞ্জ বানাতে হত। তাতে দূরদেশে ভ্রমণ আরও অনেক বেড়ে গেল। দূরদেশে ভ্রমণের ফলে আরও নানা অঞ্চলের গ্রাম ও নগরের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটল। তাঁরা আরও বেশী করে বাড়তি উৎপাদনের চেষ্টা করতে লাগলেন। এইভাবে ব্যবসা বাণিজ্য ক্রমেই বেড়ে চলল। নানা কুলের লোক এসে নগরে বসবাস আরম্ভ করার ফলে নগরের লোকজনের সংখ্যা বাড়ল। নগরজীবন ক্রমেই জটিল হয়ে উঠল।

দ্বিতীয় পাঠ

সমাজের পরিবর্তন—শ্রেণীভেদ—যুদ্ধ বিগ্রহ

সমাজে ধনী-গরীবের শ্রেণী বিভেদ এল ঃ মানুষ বাড়তি জিনিস-পত্র উৎপাদন করলেই তাঁদের হাতে ধন সম্পদ জমতে থাকল। কোনও কৃষক হয়ত অন্যের চেয়ে বেশী ফসল জন্মালেন। তাঁর ধন বাড়ল। এর আগের যুগের সমাজে আমার তোমার ভেদাভেদ ছিল না। এ যুগে তার আরম্ভ হল। যাঁর যত বাড়তি ফসল হল তার বিনিময়ে তিনি তত বেশী সম্পদ ঘরে আনলেন। তিনি হলেন তত ধনী।

কুলের সঙ্গে কুলের সংঘর্ষ শুরু হল ঃ ধনী-দরিদ্রের ভেদ শুধু নিজের কুলেই নয়, বিভিন্ন কুলের মধ্যে যত বাড়তে লাগল— ততই আরম্ভ হল এক কুলের সঙ্গে অন্যের সংঘর্ষ। তখন আরম্ভ হল হয় আক্রমণ নয়ত শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা।

ছোট ছোট গ্রামের কুলগুলি ক্রমে ক্রমে পাশের শক্তিশালী রাষ্ট্রের অধীন হয়ে পড়ল। তাঁরা তখন নিজেদের ইচ্ছেমত চাষবাস বা জিনিসপত্র তৈরী করতে পারতেন না। বিজয়ী রাষ্ট্রের রাজাকে তাঁদের কর দিতে হত, তাঁদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে হত। এক কথায় এই ভাবে নানা কুল আর গ্রাম নিয়ে আদিম রাষ্ট্রের বিকাশ শুরু হল। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের শাসন করে ধনসম্পদ বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য দেওয়াই হল এ-রাষ্ট্রের লক্ষ্য।

তৃতীয় পাঠ

নদী-উপত্যকায় সভ্যতা গড়ে ওঠার কারণ

নদী উপত্যকায় আদি সভ্যতা গড়ে উঠল কেন ঃ মানুষ কৃষিকাজ শেখার পর থেকে সভ্যতার আরম্ভ। কাজেই সভ্যতার পত্তন হয়েছে সেই সব দেশে যেখানে চাষবাস ছিল সহজ। নদীর দুধারে উর্বর পলিমাটিতে যে শস্য জন্মাতো তা দিয়ে মানুষ সহজেই নিজেদের ক্ষিধে মিটিয়ে আরও উদ্বৃত্ত শস্য জমা করতে পারতেন। অবসর সময়ে তাঁরা নানা দরকারী কাজেও মন দিতে পারতেন। এমনিভাবে তাঁরা গড়ে তোলেন নদী-উপত্যকায় বড় বড় নগর, বিরাট বিরাট অট্টালিকা, সমাধি আর দেবমন্দির। তারপর যখন ধাতু আবিষ্কার হল—তখন যে সব অঞ্চল ধাতুর খনির কাছাকাছি ছিল ততই তাদের উন্নতি হল বেশী। নদীপথে দূর দূরান্তের দেশের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করা ছিল সহজ। তাই—যেখানেই যত নদী-উপত্যকায় উর্বরা জমি ছিল, যেখান থেকে ধাতুর খনি বেশী দূরে ছিল না, যে নদীপথে যাতায়াত করা সহজ ছিল, যেখানে ঘরবাড়ির উপযুক্ত মাটি বা পাথর পেতে কষ্ট হত না—সেখানেই প্রথম সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল। পণ্ডিতেরা বলেন খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ বছর পর্যন্ত এইভাবে ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস নদীর তীরে মেসোপটেমিয়ায়, নীল-নদের তীরে মিশরে, সিন্ধুনদের তীরে ভারতে এবং হোয়াংহো নদীর উপত্যকায় আদিম চীনের সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল।
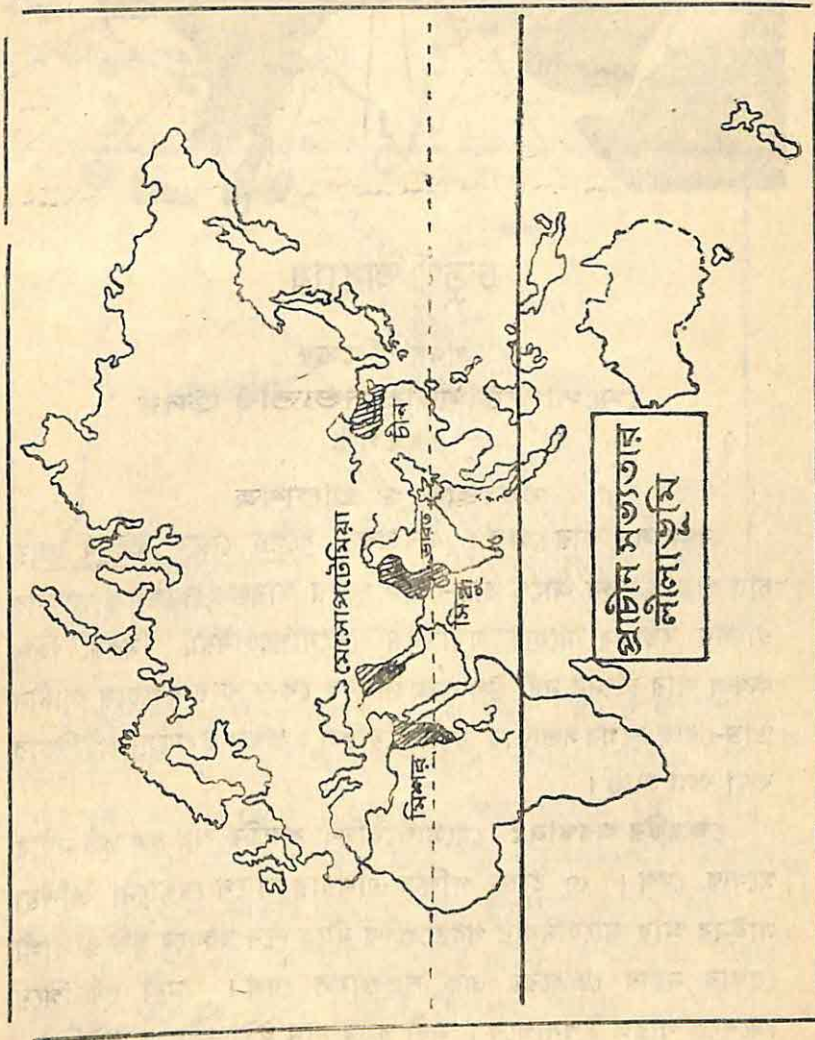
মেসোপটেমিয়া
মিশর
চীন
ভারত
সিন্ধু
প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মেসোপটেমিয়ায় সভ্যতার উদয়

প্রথম পাঠ

অবস্থান ও প্রাচীনত্ব

প্রথম সভ্যতার ক্ষেত্র : নবপ্রস্তর যুগের শেষে খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় চার হাজার বছর আগে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের আরম্ভ হয়েছিল। তারপর হাজার বছরের মধ্যেই যথাক্রমে মেসোপটেমিয়া, মিশর, সিন্ধু অঞ্চল আর চীনের নদী উপত্যকাগুলিকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে প্রাচীন তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতার উদয় হয়েছিল। প্রথমেই মেসোপটেমিয়ার কথা বলা হচ্ছে।

ক্ষেত্রটির অবস্থান : মেসোপটেমিয়া শব্দটির অর্থ হল দুটি নদীর মধ্যের দেশ। এ হচ্ছে পশ্চিম এশিয়ার ম্যাপে দেখানো এশিয়া মাইনর আর আর্মেনিয়ার পর্বতশ্রেণীর নীচে দূরে বহুদূরে দুটি রূপোলী রেখার নদীর ভেতরের এক শস্যশ্যামল দেশ। নদী দুটি গিয়ে মিশেছে পারস্য উপসাগরে। নদী দুটির নাম ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস। পারস্য উপসাগরের পশ্চিম প্রান্তে টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদীর মোহনায় প্রায় দেড়শ মাইল লম্বা শস্যশ্যামল সমভূমি এই সভ্যতার অঞ্চল। এর নাম সিনার-এর সমভূমি। আর সভ্যতার নাম **সুমের** সভ্যতা। আজকের ম্যাপে এর নাম **ইরাক**।

সুমেরীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব—এই অঞ্চলের সবচেয়ে দক্ষিণে নদী দুটির মোহনার কাছাকাছি পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। সে জায়গার নাম ছিল **সুমের**। তাই সুমের-এর অধিবাসীদের বলা হয় **সুমেরীয়**।
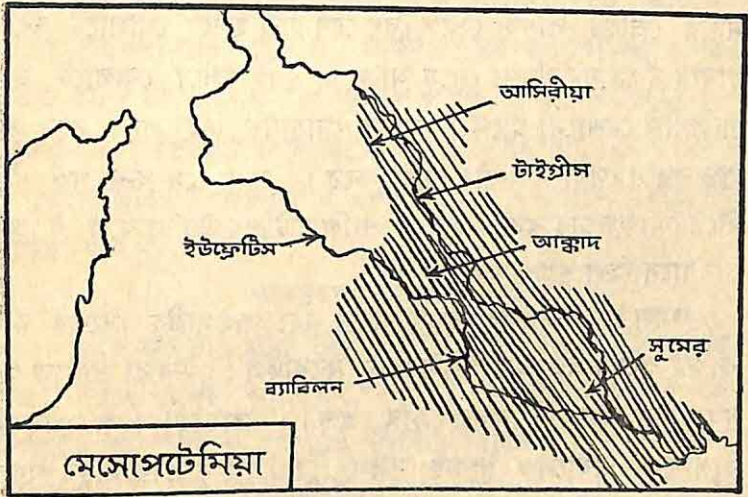
ঐ অঞ্চলের প্রাচীন নগর **উর**-এর নীচে খনন কার্য চালিয়ে রাজাদের সমাধিতে অনেক আশ্চর্য জিনিস পাওয়া গেছে। তবে একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে এখানে প্রস্তর যুগের সভ্যতার কোন চিহ্ন মেলেনি। হঠাৎ যেন এক উন্নত স্তরে সুমেরীয় সভ্যতার আরম্ভ হয়েছে। সুমেরীয় সভ্যতাই মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা বলে পরিচিত। পণ্ডিতদের মতে এই সভ্যতাই পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম, তাঁরা বলেন যে সুমেরের লিপি থেকেই মিশরের লিপির উৎপত্তি। তাছাড়া সুমেরীয় সভ্যতার আরও নানা প্রকারের ছাপ আছে মিশরের সভ্যতার উপর।

বিভিন্ন যুগের সুমের, আক্কাদ, বাবিলনের ও আসিরীয় সভ্যতাই মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার পরিচয় বয়ে বেড়াচ্ছে।

দ্বিতীয় পাঠ

জমির উর্বরা শক্তি ও ফসল

সিনার-এর সমভূমি : ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী দুটি উঠেছে আর্মেনীয় পর্বত থেকে। সেই পর্বতের চূড়ায় বরফ গলা জলে নদী দুটি ফুলে ফেঁপে নীচে নামে। পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে নামতে নদীর স্রোতে পাথর ভেঙ্গে রেণু রেণু হয়ে হলদে ঘোলাটে জলের ধারায় নীচে সমভূমিতে নেমে আসে। সেই হলদে ঘোলাটে জলে পলিমাটি মেশানো থাকে। নদীর মোহনায় এই পলি জমে শত শত বছরে সেখানে ব-দ্বীপ সৃষ্টি করে। তখন সে ব-দ্বীপেও ধীরে ধীরে লোকজনের বসতি হয়। পালিমাটি খুব উর্বরা বলে ঐ জমি চাষবাসে ছিল শস্যশ্যামল।

ফসল : সিনারের দেড়শ মাইল লম্বা পলিমাটির দেশের কৃষি-কাজই সুমের সভ্যতার ভিত্তি রচনা করেছিল। উর্বরা জমিতে গম, যব, ধান ইত্যাদি ফসল চাষ হত। তাছাড়া ছিল খেজুরের বাগান। এখানেও শস্যের ফসল খুব বেশী হওয়ায় মানুষ অবসর পেতেন। সেই অবসরে তাঁরা অত্যন্ত উঁচু এক সভ্যতা পত্তন করেছিলেন।

তৃতীয় পাঠ

বন্যার হাত থেকে আত্মরক্ষা

সভ্যতার প্রথম যুগে শস্য শ্যামল প্রান্তরের লোভে সুমেরীয়রা সিনার সমভূমিতে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু তখন সেখানে কৃষিকাজ করা তত সহজ ছিল না। আশেপাশে চারিদিক ছিল জলা আর নল-খাগড়ায় ভরা। উত্তরে আর্মেনীয় পাহাড়ের চূড়ায় গ্রীষ্মের রোদ পড়তেই বরফ গলতে শুরু করত। হু হু করে তখন নামত ঘোলাটে জলের ধারা। সেই বন্যায় দুই নদীরই তীরের সবকিছু ভেসে যেত। বন্যার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সেখানের মানুষ দূর দেশ থেকে পাথর এনে নদীর উৎপত্তি স্থানের কাছে বাঁধ বেঁধে দিলেন।

নদীর দুই তীরে উচু করে বাঁধ তৈরী করলেন। পরে পাথরের বাঁধে আটকানো জল সরাবার জন্য ছোট বড় অনেক খাল কাটলেন। খালের জল দিয়ে ক্ষেতে জলসেচ আরম্ভ হল। বাড়তি জল সঞ্চয়ের জন্য বড় বড় জলাধার নির্মিত হল। তখন বন্যা থামল ; চাষবাস আরম্ভ হল।

সুমের-এর বন্যার স্মৃতি অক্ষয় করে রাখবার জন্যে প্রাচীনকালে এক কিম্বদন্তী সৃষ্টি হয়েছিল। একদা সুমের-এর লোকের অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে ভগবান ঐ অঞ্চলে প্রবল বন্যার সৃষ্টি করেন। এক সাধুকে মাত্র তিনি সাবধান করে দেন। সেই সাধু বিরাট নৌকায় পৃথিবীর জীবজন্তু গাছপালার একটি করে নমুনা তুলে নিয়ে বন্যার হাত থেকে বেঁচেছিলেন।

অন্যান্য উপজীবিকা

সুমের সভ্যতার মূলে ছিল কৃষিকাজ। উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদের মধ্যে ছিল খেজুর আর নল-খাগড়া। আর্মেনীয় পাহাড় অঞ্চলে পশুচারণের সুযোগ থাকায় উৎকৃষ্ট জাতের ভেড়া পালতেন সুমেরীয়রা। আর নদীতে ছিল প্রচুর মাছ। ভেড়ার লোম থেকে উৎকৃষ্ট পশমের কাপড় তাঁরা বুনতেন। তবে কৃষি ছাড়া আরও কারিগরী ও হস্তশিল্পের নানা জিনিস সেখানে উৎপন্ন হত। খাদ্য শস্য ছাড়াও মাটির রকমারী বাসনকোসন, দামী পাথর এবং কাঠের নানা আসবাবপত্রও সুমেরীয়রা বানাতেন। দৈনন্দিন জীবনের দরকারী জিনিসপত্র ও মূল্যবান সোনারূপার যত অলঙ্কারও তৈরী হত এখানে। এসবের অনেক কিছু বিদেশে রপ্তানী হত। ভারতের সিন্ধু প্রদেশ ও মিশরের সঙ্গে এ-অঞ্চলের বণিকদের রীতিমত যোগাযোগ ছিল।

চতুর্থ পাঠ

সুমেরীয়দের কৃতিত্ব

বিশাল মিনার—কাঁচা ইটের মন্দির : প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী সুমেরীয়দের নানা বিষয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। সুমের

অঞ্চলে রোদে পোড়া ইটের তৈরী বিশাল বিশাল ঘোরানো মিনার ও মন্দির নির্মিত হয়েছিল। রাজধানীর নগর বিন্যাসেও যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় ছিল। রোদে পোড়ানো ইটের প্রাচীরে গোটা নগর ঘেরা ছিল। তার বাইরেই ছিল পরিখা। প্রতিটি নগরের বিশেষ বিশেষ দেবতা ছিলেন। উঁর-এর দেবতার নাম ছিল নান্নার। তিনি চন্দ্রদেব। তাঁর মন্দির ছিল চল্লিশ হাত উচু কয়েকটি তলায় বিভক্ত মিনার। এসব মন্দিরকে ঐ দেশের ভাষায় বলে **জিগুরাট** বা স্বর্গের পাহাড়।

শিল্পকার্যঃ রাজপ্রাসাদ, মন্দির ও অন্যান্য অট্টালিকার দেওয়ালে শিল্পীরা নানা কারুকার্য করতেন। সে সব দেয়াল শিল্পকলাকে **ফ্রেস্কো** বলে। তাছাড়া পাথর কেটে তার উপরেও নানা মূর্তি খোদাই করা হত। মন্দিরের দেওয়াল ছিল এসব আঁকার স্থান।

মেসোপটেমিয়ার কীলকাক্ষর

ধাতুশিল্প, যানবাহন ও বাণিজ্যঃ স্থমের-এর পাশে সিনাই অঞ্চলে তামার খনিজ পাথর পাওয়া যেত। সেই খনিজ তামা আগুনে গালিয়ে স্থমেরীয়রা অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি বানাতেন। পরবর্তী যুগে আসিরীয়রা লৌহ আবিষ্কার করে লোহার অস্ত্রশস্ত্র বানিয়ে দুর্ধর্ষ সৈন্যদল গড়ে তুলে ছিলেন। বাবিলনবাসীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁদের সঙ্গে পেরে ওঠেননি। স্থমের-এর বাণিজ্য চলত মিশর ভূমধ্যসাগর তীরের দেশ এবং সিন্ধু প্রদেশ-এর সঙ্গে। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রধান জিনিস
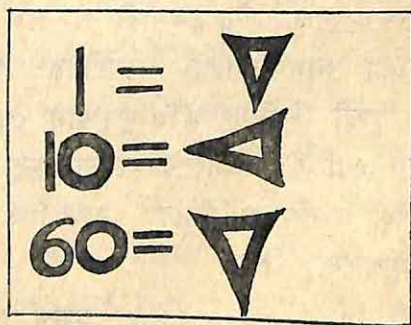
মেসোপটেমিয়ার সংখ্যা

ছিল সূতী বস্ত্র, মসলা, দামী পাথর ইত্যাদি নানা জিনিসের বাণিজ্য।

কীলকাক্ষর ঃ সুমেরের লোকেরা সর্বপ্রথম লিপি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁদের লিপি হচ্ছে কীলকের মত তীক্ষ্ণ। এঁরা মাটির পাতলা পাতে কাঁচা অবস্থায় কাঠের শলাকা বা কীলক দিয়ে লিখতেন। তাই লেখাগুলি শলাকার মত তীক্ষ্ণ আকারের হত। চার হাজার বছর আগের বিদ্যালয়ে ছাত্রদের লেখার পাতও সেখানে পাওয়া গেছে। মাটির পাতে লেখা বই-এর বিরাট বিরাট লাইব্রেরী ছিল সুমের দেশে। খনন কাজের সময় এমন অনেক লাইব্রেরী প্রত্নতাত্ত্বিকেরা খুঁজে পেয়েছেন। আসিরীয় সম্রাট অসুরবানিপালের মাটির পাতের বই-এর এক বিরাট লাইব্রেরী ছিল।

সম্রাট অসুরবানিপাল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পিরামিডের দেশ মিশর

প্রথম পাঠ

অবস্থান ও ভু-প্রকৃতি ঃ আফ্রিকার ধূসর মরুভূমির মধ্যে সরু একফালি শ্যামল রেখা এঁকে বেঁকে চলেছে। দুপাশে তার হলদে ঘুটিং-এর পাহাড়। তার পরেই আরম্ভ হল মরুভূমি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরুভূমি **সাহারা**। আর মাথায় অথৈ নীল জল ভূমধ্যসাগরের। এই দেশেরই নাম **মিশর**।

ধূসর বালির বুকে শ্যামল রেখাটি হল নীলনদ। পৃথিবীর এক আশ্চর্য নদী এই নীলনদ। এর তিনটে উপনদী—দুটো উঠেছে

আবিসীনিয়ার পাহাড় থেকে। শীতে সেখানে বরফ জমে আর গ্রীষ্মে সেই বরফ গলে তার জলে পুষ্ট হয় নীলনদ। আর তৃতীয় উপনদী উঠেছে প্রায় ছয়শো মাইল দক্ষিণে মধ্য আফ্রিকার বিরাট বিরাট হ্রদ থেকে। বিষুবরেখার এই হ্রদে গরমের সময় মুষলধারে বৃষ্টি হয়
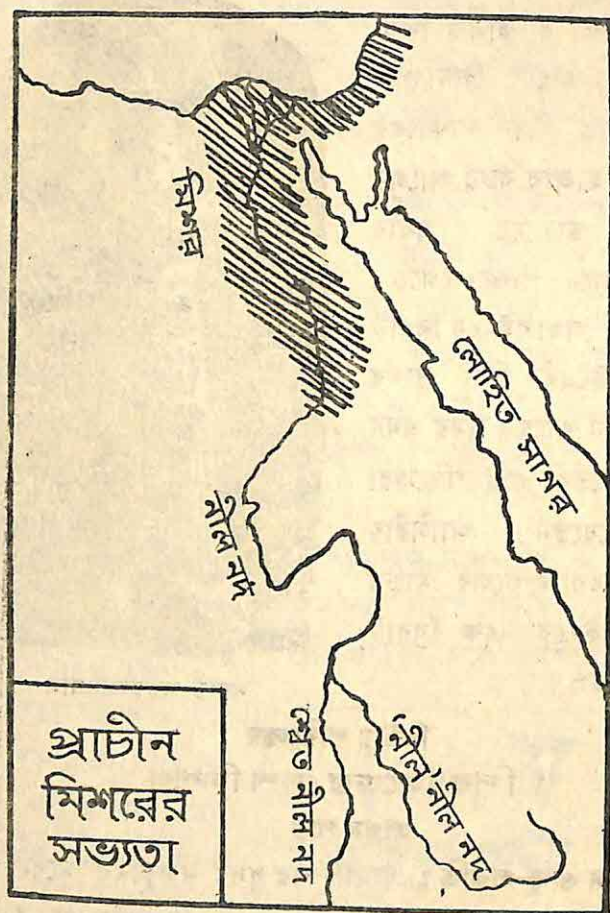
বলে নীলনদে জলের অভাব হয় না কখনো। বন্যার জলের স্রোতে সবুজ লতাপাতায় নদীর বুক ভরে থাকায় তার জল নীলাভ দেখায় বলে নাম হয়েছে নীলনদ।

আবিসীনিয়ার পাহাড়ের বরফ গলতে আরম্ভ হয় মে মাসে। সে জল মিশরের বুকে নেমে আসে জুন-জুলাই মাসে। তখন নীলনদের দুকূল ছাপিয়ে বন্যা নামে। বন্যার জল সরে গেলে রেখে যায় পাহাড়ের

গা-ধোয়া ঘোলাটে পলিমাটির উর্বর স্তর। তাতেই হয় মিশরের যত শস্য। নদীর জলে আছে মাছের ঝাঁক। তীরে গাছের ডালে ডালে যত পাখীর কাকলি। নীলনদই মিশরের প্রাণ বলে মিশরকে বলে **নীলনদের দান**। নীলনদ না থাকলে কবে মিশরকে গিলে ফেলত সাহারা মরুভূমি।

নীলনদের তুপাশে লম্বায় ছয়শো মাইল আর চওড়ায় কোথাও ৩৫ মাইল আবার কোথাও মাত্র ৫ মাইল জুড়ে মিশরে চাষবাস হয়। আদিমকাল থেকে এখানে ছিল মানুষের বসতি। প্রথম যুগের লোকজনের ছিল আলাদা আলাদা রাজা, শাসক আর দেবতা।

সভ্যতার পত্তনঃ তারপর অনেক যুগ কেটে গেলে তাঁরা বুঝলেন যে সবাই মিলেমিশে কাজ না করলে নীলনদের বন্যা ঠেকিয়ে তার জল দিয়ে ভালভাবে চাষের কাজ করা যাবে না। সমবেত চেষ্টায় কৃষিকাজে এগিয়ে যাওয়ায় মিশরবাসীর হাতে অবসর এল। সেই অবসর সময়ে তাঁরা নানা কাজ করে সভ্যতার পত্তন করলেন।

দ্বিতীয় পাঠ
রাজ্যগঠন ও অগ্রগতি
ফেয়ারো

নীলনদের উপত্যকার জায়গায় জায়গায় দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন সব জাতি বাস করতেন। ক্রমে ক্রমে আশেপাশের শক্তিশালী রাজ্য অন্যদের বসতি জয় করে নিতে লাগল। বড় বড় দলের নেতারা ধীরে ধীরে নিজেরা রাজা হয়ে বসলেন। সবচেয়ে বড় গ্রামের বড় বাড়ি যাঁর তিনি রাজপ্রাসাদ বানিয়ে সেখানে বসবাস করলেন। কালক্রমে সেটাই হল তাঁর রাজধানী। এইভাবে খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে নিম্ন মিশরের নীলনদের মোহনার ব-দ্বীপ অঞ্চলে একজন; আর উচ্চ মিশরের আর একজন রাজা রাজত্ব আরম্ভ করতেন। তারপর খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪০০ অব্দে **মেনেস** নামে এক রাজা তুই মিশরকে এক করে অখণ্ড মিশর সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন। মিশরের রাজাকে বলা হয় **ফেয়ারো**। মেনেস হলেন অখণ্ড মিশরের প্রথম ফেয়ারো। তিন হাজার বছর ধরে এই অখণ্ড

রাজ্যে কোন ফাটল ধরে নি। পর পর তিরিশটি রাজবংশ এখানে রাজত্ব করেছে। মাঝখানে একবার আর্যবংশীয় **হিকশাস** জাতি বহু বছর মিশরকে অধীন করে রেখেছিলেন। এঁরাই মিশরে ঘোড়ার ব্যবহার আরম্ভ করেন।

পুরোহিততন্ত্র

মিশরের লোকেদের মধ্যে ধর্মভাব প্রবল ছিল। সেজন্য পুরোহিতদের খুব আদর ছিল মিশরে। তাছাড়া মিশরের লোকের প্রাণ ছিল নীলনদের বন্যা। কখন নদীতে বন্যা নামবে—তা জানতেন শুধু পুরোহিতরা। দলে দলে লোক তাঁদের মুখ থেকে বন্যা-নামার সংবাদ জানতে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। আকাশের কোণার লুব্ধক নক্ষত্রের অবস্থান দেখে পুরোহিতরা বলতে পারতেন কখন নীলনদে বন্যা নামবে। তখন কৃষকরা নামতেন চাষবাস করতে।

ক্রমে ক্রমে পুরোহিতদের ক্ষমতা খুব বেড়ে গেল। মিশরের সমাজে তাঁদেরই প্রতাপ ছিল বেশী। যাগযজ্ঞ, ধর্মকর্ম সব কিছুতে তাঁদের নির্দেশ মেনে চলতে হত। সবচেয়ে বড় দেবতা আমন-রে দেবের পুরোহিত আর ফেয়ারোর মধ্যে কে যে বড় তা নিয়ে বহুদিন বিবাদ চলেছিল মিশরে।

তৃতীয় পাঠ

চিত্রলিপি ও লিপিকার

মিশরের লোকেরা এক অদ্ভুত চিত্রলিপি আবিষ্কার করে নিজেদের কাহিনী লিখে গেছেন। সে লিপি আমাদের মত নয়।

পাপিরাস মোড়ক

এই লিপিতে লেখা ফেয়ারো মেনেস-এর আমল থেকে অনেক ইতিহাস আমরা জানতে পেরেছি। মিশরের পিরামিডের গায়ে তখনকার মানুষের জীবনের অনেক কাজকর্মের ছবি আছে। এমন একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে মিশরের ছুতোরেরা আসবাবপত্র বানাচ্ছেন। মিশরের

পুরোহিতরা মন্দিরে মন্দিরে পাঠশালা খুলে ছাত্রদের পড়াতেন। তাঁরা লিখতেন **পাপিরাস** নামে একরকম নল খাগড়ার পাতার
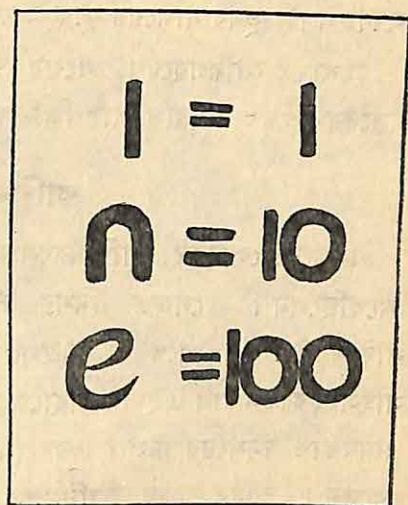
মিশরের চিত্রলিপি মিশরের সংখ্যা

কাগজের মত জিনিসের উপর। সেটা ভাঁজ করে জড়িয়ে রাখা যেত। পাপিরাস থেকেই ইংরাজী পেপার এসেছে।

রাজস্ব সংগ্রাহক, যোদ্ধা ও শ্রমিক

মিশরের সাম্রাজ্য যখন খুব বড় হল তখন সে সাম্রাজ্য চালাবার ব্যয় বেড়ে গেল। ফেয়ারোকে তখন সমস্ত কৃষক ও কারিগরদের কর দিতে হত। কর আদায়ের জন্য বিশেষ রাজকর্মচারীও ছিলেন। তাঁদের হাত থেকে কারও রক্ষা ছিল না। যাঁরা খাজনা আদায় করতেন তাঁদের কাজ ছিল কৃষকদের জমি জমা, গাছ গাছড়ার হিসেব রাখা। কারণ সেই হিসেব অনুসারে তাঁদের খাজনা দিতে হত। ঠিক মত খাজনা না দিলে সকলে শাস্তি পেতেন।

প্রথম যুগে মিশরের লোক ছিলেন খুব শান্তিপ্রিয়। পরে বিভিন্ন যুগে মিশরের সেনাবাহিনী বৃদ্ধি পেল। যুদ্ধের রথ তৈরী

হল। রথ ও বিশালবাহিনী নিয়ে মিশর সম্রাটগণ দেশে বিদেশে দিগ্বিজয়ে বের হতেন। সারা পশ্চিম এশিয়া তাঁদের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। ভূমধ্যসাগরের বুকে তাঁদের নৌবাহিনী টহল দিত।

মিশরের কারিগরদের কাজের সুনাম ছিল। সাম্রাজ্যের যুগে দাসদের দিয়েও চাষবাস আর জিনিসপত্র তৈরী করানো হত।

বাণিজ্য

মিশরের লোকেরা পৃথিবীর অন্যদেশের আগে জাহাজ বানাতে শিখেছিলেন। সেজন্য মিশর সম্রাটদের নৌবহর ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। নদীপথে বা সমুদ্রপথে কেউ মিশরকে আক্রমণ করতে সাহস করতেন না। এই সব জাহাজে চড়ে সৈন্যরা যেমন যেতেন, তেমনি বণিকরাও মিশরের উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে দেশবিদেশে বাণিজ্য করতে যেতেন। সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলি—ক্রীট, ফিনিসিয়া, প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়ায়, আর সিন্ধুপ্রদেশে নিয়ে গিয়ে বিনিময় করে আসতেন। সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্জোদড়োতে মিশরের কিছু আসবাবপত্রেরও চিহ্ন আছে। মিশর থেকে এসব অঞ্চলে চালান যেত গম, ক্ষৌমবস্ত্র, এবং সুন্দর সুন্দর মাটির পাত্র। মিশরে আমদানী করা হত সোনা, রূপা, হাতীর দাঁত, ভাল কাঠ এবং ধূপধুনা, তৈল প্রভৃতি বিলাস দ্রব্য।

চতুর্থ পাঠ
পৃথিবী অবাক করা পিরামিড

পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি হল মিশরের পিরামিড। পুরাকালে কেউ মারা গেলে তাঁর সমাধির উপরে স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করা ছিল মিশরবাসীদের রীতি। এই সব স্মৃতিস্তম্ভই হচ্ছে পিরামিড। সাধারণ মানুষের সমাধিতে তেমন বেশী ব্যয় হত না। কিন্তু ধনীদের এবং বিশেষত রাজারাজড়াদের সমাধি হত বিরাট আর জমকালো। সে সব সমাধিতে অর্থ ব্যয়ের কোনও সীমা পরিসীমা থাকত না।

মিশরের রাজধানী কায়রোতে নীলনদের পশ্চিমতীরে মরুভূমির
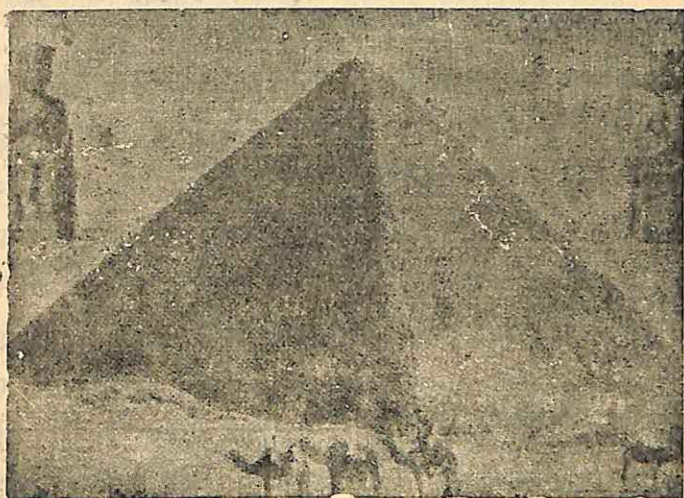
সম্রাট ক্ষু-ফুর পিরামিড

শেষ সীমান্ত গির্জা-তে সবচেয়ে বড় বড় পিরামিড আছে। তা নির্মিত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে—অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় সাড়ে
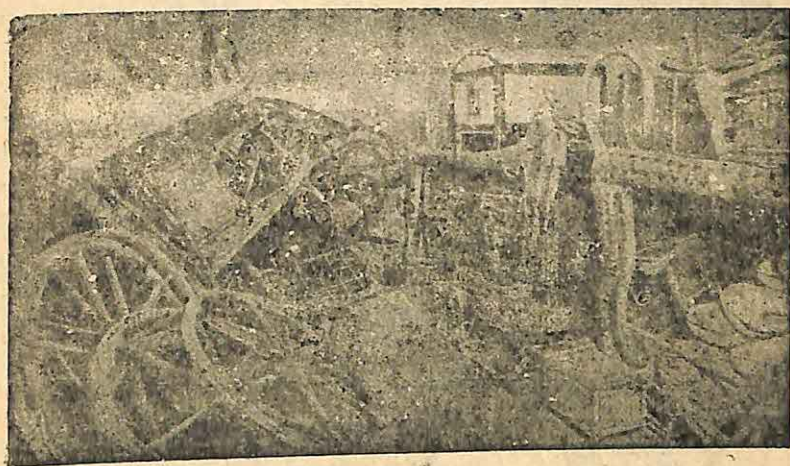
তুত আঙ্খ খামেনের সমাধির জিনিস পত্রের ছবি

চার হাজার বছর আগে। পিরামিডটির ভিত্তি বর্গক্ষেত্রের

আকারের। সে বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেকটি দিক ২২৫ মিটার, আর এর উচ্চতা ১৫০ মিটার। প্রায় ২½ টন ওজনের এক একটা ভারী পাথরের চাঁই দিয়ে এটি গঠিত। গোটা পিরামিডটিতে এমন ২৩ লক্ষ পাথরের চাঁই আছে। একটির উপর আর একটি চাঁই অতি সুন্দর করে সাজানো। কি করে যে তখন ঐ ভারী পাথরের চাঁই এতো উঁচুতে তুলে এমন সুন্দরভাবে সাজানো হত তা আজও সকলের কাছে রহস্য হয়ে আছে। লোকের বিশ্বাস প্রায় এক লক্ষ দাস কুড়ি থেকে তিরিশ বছর একটানা কাজ করে তবে ঐ বিরাট পিরামিড গড়েছিলেন। শুধু তিনটে ঘর ছাড়া ঐ বিরাট পিরামিডের সবটা পাথরে ভরা। যে সম্রাটের দেহ এখানে সমাধিস্থ করা হয়েছে তাঁর নাম **ক্ষু-ফু**; তিনি, তাঁর পাটরাণী আর ছেলে কাফ্রী এই তিনজনকে রাখা হয়েছে সেই তিনটি ঘরে।

মমী

উচ্চ মিশরের দিকে এগিয়ে গেলে **থীবস্** নামে একটি নগর আছে। সেখানে অনেক রাজার সমাধির পিরামিড আছে। এসব পিরামিডে রাজার দেহের পাশে এঁদের ব্যবহারের সোনার আসবাব পত্র, হীরা জহরতের অলঙ্কার—এইসব মহামূল্য জিনিস থাকত বলে মরুভূমির ডাকাতেরা সুযোগ পেলেই পিরামিড লুঠ করত। সৌভাগ্য বশত **তুত আঙ্খ আমেন নামে** এক সম্রাটের পিরামিডে এইসব মহামূল্য জিনিসপত্র ভালভাবে রক্ষিত ছিল। তিনি রাজত্ব করতেন ১৩৫০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। কায়রো মিউজিয়মে এসমস্ত আছে।

মমী ঃ পিরামিডের মধ্যে সম্রাটের দেহ এমনভাবে রাখা হত যাতে তা না পচতে পারে। কেউ মারা গেলে তাঁর পেটের নাড়িভুঁড়ি বার করে সারা শরীরে একরকম ওষুধ লাগিয়ে রাখলে আর সে দেহ পচতো না। এতদিনের সে মমী আজও নষ্ট হয় নি।

পঞ্চম পাঠ
ধর্ম বিশ্বাস

প্রাচীনকালে মিশরের লোকের বিশ্বাস ছিল যে সূর্য, চন্দ্র, নীল-নদ বা চারিদিকের জীবজন্তুদের মধ্যে কোন না কোন আত্মা আছে।
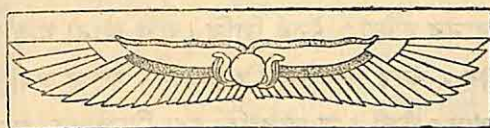
মিশরের দেবতা রে-আমনের চিহ্ন

তাঁর প্রভাবেই মানুষের জীবনে ভালমন্দ যা কিছু ঘটে। এ সব আত্মাকেই ভগবান বলে সবাই পূজা করতেন। সূর্যদেবের নাম ছিল
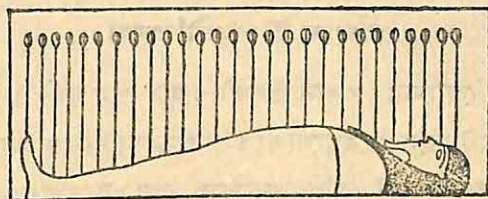
মিশরের কৃষি দেবতা ও সিরিসের চিহ্ন

রে ও আমন। কৃষি কিংবা নীলনদের দেবতার নাম দেওয়া হয় **ওসিরিস।** বিড়াল কুমীর ভেড়াকেও দেবতার অবতার বলে পূজা করা হত। কার্ণাকের আমন দেবের পুরোহিতের ক্ষমতা ছিল মিশরের মধ্যে সবচেয়ে বেশী।

আমাদের মত মিশরবাসীরাও আত্মা অবিনশ্বর বলে মনে করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল মৃত্যুর পর দেহ নষ্ট না হলে আত্মা সে দেহ ছেড়ে যাবে না। তাই তাঁরা এত কষ্ট করে মৃতদেহ মমী করে রাখতেন।

বেঁচে থাকলে মানুষ যে সব জিনিস ব্যবহার করতেন মমীর সঙ্গে সমাধিতেও তাঁর ব্যবহারের সব জিনিস রেখে দেওয়া হত। তাই দেখা গেছে তুত আঙ্খ আমেনের সমাধিতে ছিল সোনার সিংহাসন, বেড়াতে যাবার সোনার রথ, তাছাড়া যত রাজ্যের সোনার গহনাপত্র এমন কি দাসদাসীরও পুতুল।

মিশরের দেবদেবীর মন্দির তৈরী হত বিরাট আকারে। সে সব মন্দির যেমন বিরাট তেমনি গুরুগম্ভীর। সবচেয়ে বড় মন্দির ছিল কার্ণাকের আমনদেবের মন্দির। মন্দিরের গায়ে, পিরামিডের দেয়ালে চিত্রলিপিতে নানা কাহিনী লিপিবদ্ধ করা আছে। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাও ঐসব লিপি থেকে জানা যায়।

দেবদেবীর মন্দিরে কালক্রমে অনেক ধন সম্পদ জমা হতে থাকে। সেসব ধনসম্পদের কর্তা হয়ে পুরোহিতেরা নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। রাজারাও প্রচুর প্রণামী দিতেন এঁদের।

ষষ্ঠ পাঠ

প্রধান উপজীবিকা

মিশরের লোকের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি কাজ। কৃষির মধ্যে গম, যবই ছিল উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ধানও হত। নীলনদ থেকে সেচখাল কেটে কৃষি জমিতে জল সরবরাহ করা হত। জলসেচের জন্য সরকারের একটি বিশেষ বিভাগই ছিল। কৃষি কাজ ছাড়া ছিল মৎস্য চাষ আর ফলের বাগান। জলপাই, খেজুর আর ডুমুরের চাষ খুব জনপ্রিয় ছিল। মিশরের ডুমুর ফল ছিল খুব উপাদেয়। এ ছাড়া ছিল আপেল, পীচফল ও তুতফল।

কৃষি কাজ ছাড়াও হাতের কাজে মিশরের লোকেরা অত্যন্ত পটু ছিলেন। সুন্দর সুন্দর কাপড় বুনবার জন্য ছিলেন নিপুণ তাঁতী। কাঠের আসবাব পত্র তৈরীর জন্যও নিপুণ ছুতোর ছিলেন। তা ছাড়া মিশরবাসীরা খুব সুন্দর সুন্দর রঙীন কাঁচের জিনিস তৈরী

করতে জানতেন। তাঁদের কাছ থেকে ক্রীট দ্বীপের অধিবাসীরা পরে এই বিদ্যা শিখেছিলেন। চামড়ার কাজও মিশরীয়রা খুব ভালভাবে জানতেন। তাঁদের চামড়ার জিনিসের অত্যন্ত সুনাম ছিল সর্বত্র। মিশরের লোকেরা খুব সৌন্দর্যপ্রিয় জাত। তাঁরা সামান্য বাসন-কোসনও এমন সুন্দর চিত্র বিচিত্র করে তৈরী করতেন যে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত।
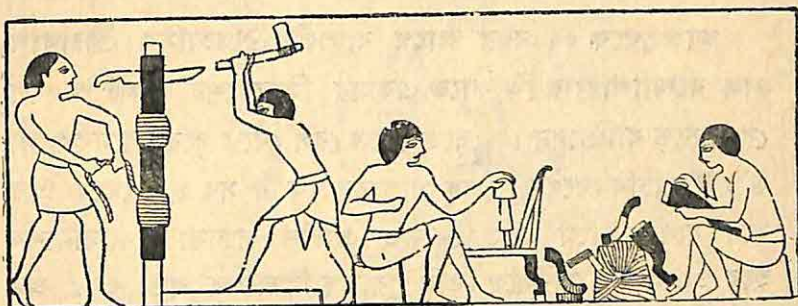
মিশরের ছুতোরেরা কাজ করছেন

অবশেষে একদিন মিশরেরও দুর্দিন এল। প্রাচীন ফেয়ারো গেলেন, পুরোহিতও গেলেন। প্রাচীন রাজত্ব লোপ পেল। তাঁরা যে ভাষায় কথা বলতেন তা বোঝবার শেষ লোকটি রইল না মিশরে। তারপরে ১৭৯৯ খ্রীঃ শাঁপলিয় নামে এক ফরাসী ইঞ্জিনীয়র কুড়ি বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় প্রাচীন মিশরের চিত্রলিপির পাঠোদ্ধার করে মিশরের অতীত ইতিহাস আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। নীল নদের মোহনায় পাওয়া রসেটা পাথরের উপর তিনটি ভাষার লিপি থেকে তিনি সে পাঠোদ্ধার করেছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা

প্রথম পাঠ

কি করে আবিষ্কার হলো

এবার আমরা আরব সাগরের পূর্বে আর একটা মরুর দেশে আসব। সে আমাদেরই ভারতবর্ষের বুকে (এখন পাকিস্তানে)

একফোঁটা একটু দেশ। সিন্ধুনদের মোহনার মুখে পশ্চিম তীরের সেই ছোট্ট অঞ্চলের নাম **মহেনজোদড়ো**। করাচী থেকে দুশো মাইল দূরে পাঞ্জাব যাবার পথে পড়ে স্থানটি। আর একটি শহর এরও চারশ মাইল উত্তরে আছে। তার নাম **হরপ্পা**। মহেনজোদড়ো আর হরপ্পাতে দেখা দিয়েছিল মেসোপটেমিয়া আর মিশরের মতই এক প্রাচীন সভ্যতার আলো।

আজ থেকে ৫৭ বছর আগে বাঙ্গালী ঐতিহাসিক **শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়** কি কাজে একবার সিন্ধুদেশের একটি অঞ্চলে রেলে চড়ে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে রেল থেকে দূরে অনেকগুলো উঁচু উঁচু ঢিবি দেখেন। ধূধূ প্রান্তরের বুক ঐ সব স্তূপ দেখে তাঁর মনে সংশয় জাগে হয়ত কোনও প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ হবে ওগুলো। অবিলম্বে তিনি পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্তা স্যার জন মার্শালের অনুমতি নিয়ে সেখানে খনন কার্য চালান। খুঁড়তে খুঁড়তে বেরিয়ে এল এক জমকালো শহরের ধ্বংসাবশেষ। সে শহরের নাম **মহেনজোদড়ো**, যার অর্থ মৃতের স্তূপ।

এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাঞ্জাবের মণ্টোগোমারী জেলায় (বর্তমানে পাকিস্তানে) **দয়ারাম সাহনী**ও একটা স্তূপ খুঁজে পান। সেখানেও ছিল ঠিক মহেনজোদড়োর মত আর একটি শহর, তার নাম **হরপ্পা**। সিন্ধুনদের উপত্যকা জুড়ে শহর দুটি ছিল বলে এ অঞ্চলের সভ্যতার নাম **সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা**।

সভ্যতার বিস্তার ঃ চণ্ডীগড়ের কাছে **রূপার**, গুজরাটে আহমেদাবাদের **লোথাল**, রাজস্থানের কাছে **কালিবঙ্গান** এবং সিন্ধুর কাছে **কোট দোর্জি** অঞ্চলেও আবিষ্কৃত সভ্যতার সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতা না বলে এদের নাম দিয়েছেন **হরপ্পা সংস্কৃতি** বা সভ্যতা। হরপ্পা সংস্কৃতি গোটা সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাব, কাথিওয়াড় এবং গুজরাট অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন কোন সভ্যতাই এত ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে দেখা দেয় নি।

হরপ্পা সভ্যতার লোকেরা লিখতে জানতেন। তাঁদের লেখাও ছিল চিত্রলিপি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ পর্যন্ত সে লেখার অর্থ কেউ বুঝতে পারেননি। সুমের ও মিশরের প্রায় একই সময়ের সভ্যতা হরপ্পার। ২৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে হরপ্পা সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল।
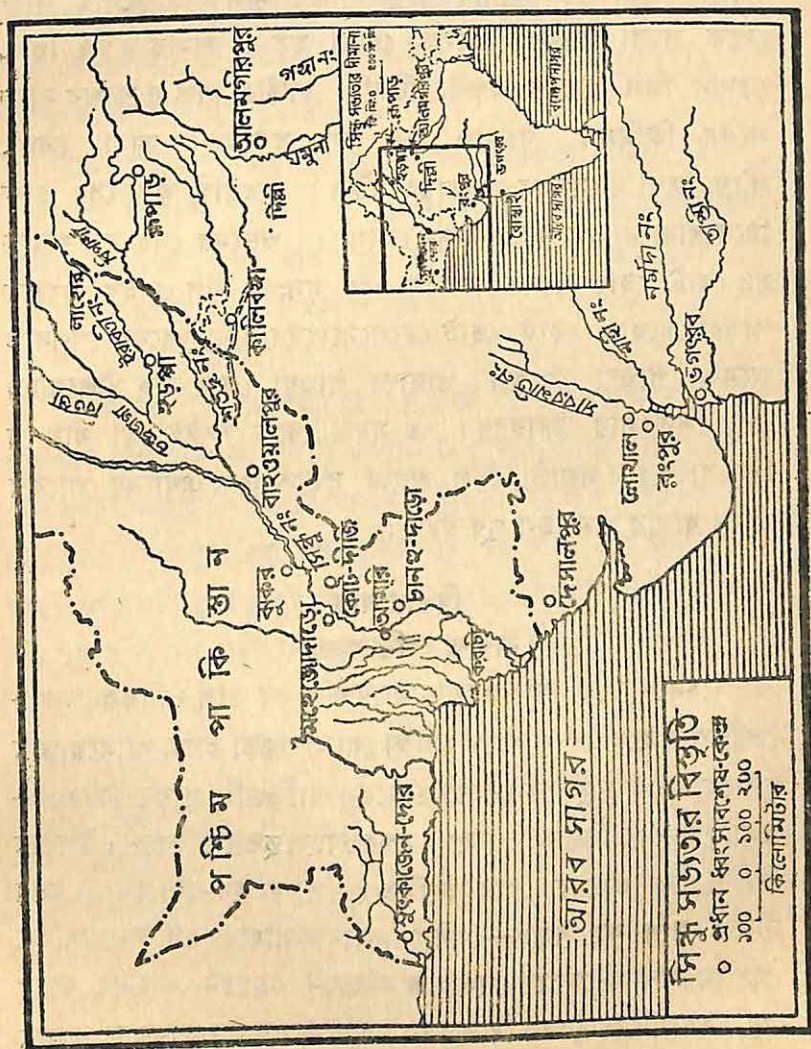
আবিষ্কৃত নানা জিনিস

মহেনজোদড়ো-হরপ্পার তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ ঃ এযুগের মানুষ শিক্ষা দীক্ষায়, সভ্যতায় খুব উন্নত ছিল। তার পরিচয় এখানের জিনিসপত্র থেকেই পাওয়া যায়। এখানে পাওয়া গেছে পাথরের লাঙ্গল, গাড়ী, হামান দিস্তা, তামা ও ব্রোঞ্জের কাস্তে, করাত, বাটালী, ছুরি ইত্যাদি। কাপড় বোনার মাকুও আছে অনেক। তুলোর পাঁজ থেকে সূতো পাকিয়ে কাপড় বোনা হত। তামার ছুঁচও ছিল, তেমনি ছিল হাড়ের বড়শী, চিরুনি, হাতীর দাঁত ও শঙ্খের নানা শখের জিনিস। গহনাও ছিল কত রকমের! তামা, ব্রোঞ্জ, শাঁখ, রূপা ও সোনার অলঙ্কারও ছিল। হরপ্পায় কুমোরের চাক দিয়ে বানানো হত মাটির বাসন কোসন। ওজনের সের বাটখারার মত ছোট ছোট মাপের জিনিস এবং অসংখ্য শীল মোহর এখানে পাওয়া গেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নানা ধরনের খেলনাও অনেক পাওয়া গেছে। তাছাড়া পাওয়া গেছে বহু সীলমোহর এবং শিল্পকলার উদাহরণ। এ সমস্ত থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতা ছিল শহুরে সভ্যতা এবং এখানের লোকের জীবন যাত্রার মান ছিল খুব উন্নত।

দ্বিতীয় পাঠ

নগর পরিকল্পনা

মহেনজোদড়ো আর হরপ্পার নগরগুলি খুব ভাল পরিকল্পনা করে তৈরী করা হয়েছিল। আগে সোজা সোজা চওড়া রাস্তা বানিয়ে তার দুপাশে ঘরবাড়ি তুলতে দেওয়া হয়েছে। বাড়িগুলি পাকা ইটের এক-তলা, দোতলা, তিনতলা পর্যন্ত। নগরটি ছিল দুভাগে বিভক্ত। উপরের দিকটা উঁচু চত্বরের উপর নির্মিত। তাকে দুর্গ বলা হয়। আর নীচের অংশ বহু বিস্তৃত—সেখানে অনেক সাধারণ লোকের বসতি। সেখানে তাঁরা নিজেদের পেশাগত কাজকর্ম করতেন। হঠাৎ বন্যার ভয় দেখা দিলে নীচের দিকের লোকেরা দুর্গের উচু জায়গায় আশ্রয় নিতেন। এই নগর পরিকল্পনা অতি আধুনিক বলে মনে হয়।

দুর্গ অঞ্চল : হরপ্পার দুর্গ-অঞ্চলের সবচেয়ে দেখবার মত জিনিস হল বিরাট বিরাট শস্যাগার। নদীর কাছে বড় বড় আয়তক্ষেত্রের আকারে এগুলি নির্মিত। নৌকায় শস্য এনে সরাসরি এখানে তোলা হত। শস্যাগারের পাশে ছিল কামার শালা। তামা, ব্রোঞ্জ, সীসা, টিনের কাজ হত এখানে। কুমোরের চাক চলত এর পাশেই। কাছেই ছিল শ্রমিকদের ছোট ছোট ঝুপরীর মত ঘর। দুর্গের অংশে ছিল যত সরকারী ঘরবাড়ী, শস্যাগার, গুরুত্বপূর্ণ কারখানা, আর ধর্মের মন্দিরের দালান কোঠা।

মহেনজোদড়োর উঁচু প্রাচীরের মত ঢিবির আড়ালেও সরকারী ও অন্যান্য ঘরবাড়ি অবস্থিত। একটা দালান দেখে মনে হয় সভা সমিতির হলঘর কিংবা বাজারের দালান। মহেনজোদড়োর দুর্গ এলাকায় সবচেয়ে বিখ্যাত হল বিরাট স্নানাগার। সে স্নানাগার ঠিক এখানকার মত আরামদায়ক।

পরিকল্পনা : মহেনজোদড়োর নীচের দিকের রাস্তাগুলি সব পরস্পরে সমকোণে কাটাকাটি করেছে। রাস্তাগুলি সেযুগের তুলনায় বেশ চওড়া, অন্তত ১০ মিটার বা ২০ মিটারের মত হবে। বাড়িগুলোর দেওয়াল বেশ পুরু এবং পলেস্তারা আর রঙ করা। ছাদ সমতল। ঘরের জানালা দরজা বোধ হয় কাঠের ছিল। রান্নাঘরে উনুন আর শস্য কি তেল রাখবার বাসন কোসন থাকত। সব বাড়ির একপাশে স্নানের ঘর আছে। এর পাশেই ছিল ড্রেন। সে ড্রেন গিয়ে রাস্তায় মিশেছে। নর্দমাগুলোর মাঝে মাঝে ঝাঁঝরাও ছিল। বাড়ির মধ্যে উঠোন ছিল। তার একপাশে রুটি সেঁকার তন্দুর থাকত। সেখানে বসে গৃহিণীরা মশলা পিষতেন হামান দিস্তায়। গৃহপালিত কুকুর কি ছাগলও হয়ত উঠোনে বাঁধা থাকত। অনেক বাড়িতে জলের কূয়ো ছিল, তাছাড়া ছিল সরকারী জলের ব্যবস্থা। শস্যা-গার ও ইটের পাঁজায় যে সকল শ্রমিক কাজ করতেন তাঁরা খুপরির মত ছোট ছোট ঘরে বাস করতেন।

তৃতীয় পাঠ

খাদ্য ও ব্যবহারের নানা জিনিস

সিন্ধুসভ্যতার খাদ্য : সিন্ধু সভ্যতার মূলে ছিল কৃষিকাজ। কৃষির ফসল হচ্ছে প্রধানত গম আর যব। লোকেরা শস্যবোঝাই নৌকা শস্যাগারের কাছে এনে গোলায় ফসল তুলে দিতেন। সমস্ত শস্য পেষা হত যাঁতা বা উদুখলে। সে আটা বা ময়দা পিষে সেঁকে নেওয়া রুটি ছিল প্রধান খাদ্য। তাছাড়া ছিল ডালিম আর কলা। মাছ মাংস সে যুগের লোকেরা খেতেন।

মহেনজোদড়োর নাগরিক জীবন (কাল্পনিক)

সাজ-পোষাক : সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা কাপড় বুনতে জানতেন। কার্পাস গাছ থেকে তুলো নিয়ে হয়ত ঘরে বসে টাকুতে সূতো তৈরী করতেন তাঁরা। তারপর সেই সূতো দিয়ে বুনতেন কাপড়। মেয়েরা ঘাগড়ার মতো করে কাপড় পরতেন—কোমরে সেটা বেল্ট দিয়ে আঁটা থাকত। পুরুষেরা লম্বা কাপড়ে সারা দেহ জড়িয়ে রাখতেন। কাপড় চোপড় বেশির ভাগ ছিল তুলোর ; তবে পশমের কাপড়ও ছিল। মেয়ে-পুরুষ সকলেই অলঙ্কার পরতে ভালবাসতেন।

পুরুষেরা পরতেন কবচ, মেয়েরা ব্রেসলেট, নেকলেশ ইত্যাদি। সাধারণ মানুষ শাঁখের পুঁতি জুড়ে এসব গহনা বানাতেন, আর ধনীরা সোনা রূপার অলঙ্কার পরতেন।

আমোদ-প্রমোদ খেলনাঃ সিন্ধু সভ্যতার একটা বিশেষত্ব অবসর বিনোদনের উপকরণ। ছোটদের জন্যও নানা ধরনের খেলনা ছিল এখানে। গরুর গাড়ির ছোট ছোট সংস্করণ, বড় বড় হিংস্র জীবজন্তুর আকৃতির পুতুলও ছিল। এসব জীবজন্তুর হাত পা নাড়িয়ে ছোটদের আনন্দ দেবারও ব্যবস্থা ছিল।

আবক্ষ পুরুষমূর্তি

বাসনপত্রঃ লোকজনের বাড়িতে নানা রকমের বাসনপত্র ছিল। বেশীর ভাগ বাসনই ছিল পোড়ামাটির, লালচে পাটকিলে রঙের।

ভাল জিনিসের গায়ে জ্যামিতিক ছকে নয়ত ফুটকি কি রেখা দিয়ে নক্সা কাটা থাকত। বিদেশে পাত্রগুলির খুব চাহিদা ছিল।

ভাস্কর্যের উদাহরণ ঃ হরপ্পা সংস্কৃতির ভাস্কর্যের কাজও খুব সুন্দর একজন পুরুষ মানুষের আবক্ষ মূর্তি অতি চমৎকার। আর একজন নর্তকীর নৃত্যের ভঙ্গীর ব্রোঞ্জের মূর্তি মনে হয় একেবারে জীবন্ত।

সীলমোহর ও লিপি ঃ কয়েকটি অঞ্চলে শত শত সীলমোহর পাওয়া গেছে। সীলমোহর-গুলির আকার ছোট। তবে তার গায়ে চমৎকার সব মূর্তি ও লিপি খোদাই করা। কোনওটাতে ককুদ-বিশিষ্ট ষাঁড়, গণ্ডার, হাতী, বিছা, সাপ এই সবের মূর্তি খোদাই করা হয়েছে। একটি সীলে তিন মুখের এক শিংওয়ালা পুরুষ দেবতার মূর্তি আছে।

মহেনজোদড়োর একটি সীলমোহর

হরপ্পার সংস্কৃতির প্রায় ২৭০টি লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে সে লিপির পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি।

চতুর্থ অধ্যায়

শিল্প বাণিজ্য

কারুশিল্প ঃ সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে কাপড় বোনা, ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ, মৃৎপাত্র নির্মাণ, পাথর খোদাই, হাতীর দাঁতের কাজ, অলঙ্কার নির্মাণ প্রভৃতি কাজ এখানে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছিল। সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলে বহু লোক সূতো কেটে তুলোর আর পশমের কাপড় বুনে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কাপড় চোপড় যেমন নিজেদের দরকারে লাগত

তেমনি সেসব পারস্য উপসাগরের তীরের দেশে ও সুমের-অঞ্চলেও রপ্তানি হত। তবে কুমোররাই সম্ভবত সবচেয়ে বেশী ব্যস্ত থাকতেন। তাঁদের চমৎকার রঙীন নক্সা কাটা বাসন কোসনের চাহিদা ছিল সর্বত্র। তাছাড়া পুঁতি, তাবিচ-কবচেরও খুব আদর ছিল। মাটি, পাথর, শাঁখ আর হাতীর দাঁতের পুঁতি হত। ধাতু নিয়ে যে-সব কর্মকার কাজ করতেন তাঁরা তামা ও ব্রঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি বানাতেন। তার মধ্যে প্রধান ছিল বর্শা, ছুরি, তীরের ফলক, কুড়াল, বঁড়শী আর ক্ষুর। পাতলা ধাতু দিয়ে তৈরী বাসনও গৃহস্থালিতে ব্যবহার হত। তবে এগুলি ভীষণ দামী বলে সম্ভবত কেবল ধনীরাই ব্যবহার করতেন। স্যাঁকরাদের গহনা তৈরীর কাজ আশ্চর্য রকমের উন্নতি লাভ করেছিল। গলার নেকলেস, হাতের বালা, চুড়ি—দেখতে ছিল অপূর্ব।

বাণিজ্য ঃ স্থল ও জলপথে হরপ্পা সংস্কৃতির লোকেদের সঙ্গে ভারতের ভিতরে ও পারস্য উপসাগরের তীরের দেশ এবং সুমের-এর লোকের সঙ্গে এদের মধ্যে নিয়মিত বাণিজ্য চলত। একে অপরের দেশে নিয়মিত ভাবে যেমন পণ্য রপ্তানী করতেন তেমনি নানা জিনিস আমদানীও করা হত সে সব দেশ থেকে। মহেনজোদড়োয় তৈরী সীলমোহর আর জিনিসপত্র বাবিলনেও অনেক পাওয়া গেছে। এ সমস্ত পণ্যদ্রব্য গুজরাটের **লোথাল** বন্দর থেকে আনা নেওয়া হত। প্রাচীনকালের জাহাজের ডক একটা এখানে আবিষ্কার হয়েছে।

ব্যবসা বাণিজ্য করতে হলে মাপ-জোখের বাটখারা চাই। মহেনজোদড়োতে এমন অনেক বাটখারাও আছে। হরপ্পার ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য উপলক্ষে সুমের-এর নগরে বসবাস করতেন। অনেকে যে উর এবং লাগাস নগরে তাঁদের প্রতিনিধি পাঠাতেন তারও প্রমাণ আছে। এঁরা তামা আনতেন রাজপুতানা থেকে, আজমীর থেকে আনতেন সীসা আর দাক্ষিণাত্য থেকে দামী দামী হীরা জহরত। সুমের-এর বহু বিলাস দ্রব্যও এখানে ছিল।

পঞ্চম পাঠ

ধর্মবিশ্বাস ও পূজা অর্চনা

মিশর, মেসোপটেমিয়ার মত সিন্ধু সভ্যতার লোকজন এমন চিহ্ন রাখেন নি যা থেকে তাঁদের শাসন ব্যবস্থায় সমাজ বা ধর্মের বিষয় ভালভাবে জানা যায়। যে সব জিনিস পাওয়া গেছে তা থেকে আমরা শুধুমাত্র এ বিষয়ে আন্দাজ করতে পারি। মিশর-মেসোপটেমিয়ার মত দেবতাদের কোনও মন্দির এখানে পাওয়া যায় নি। এখানে জীবজন্তু, গাছপালা, সমস্তই পবিত্র বলে পূজা করা হত। এখনকার শিবলিঙ্গের মত সে যুগের অনেক পাথর দেখে মনে হয় শিবলিঙ্গের পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এখানের পূজা অর্চনার অনেক বিষয় সারা ভারতের ধর্ম ও পূজা অর্চনাকে প্রভাবিত করেছে। মাতৃদেবীর অসংখ্য মূর্তি দেখে মনে হয় ঐ অঞ্চলে তাঁর পূজা হত।

একটি সীলে তিন শিঙওয়ালা এক পুরুষ দেবতার মূর্তি আছে। তিনি জোড় আসন করে যোগের ভঙ্গীতে বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে নানা পশু পাখী চারিপাশে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকের মতে ওটাই পশুপতিনাথ শিবের মূর্তি। যে গাছের নিচে তিনি বসেছিলেন সে গাছও সম্ভবত পবিত্র বলে মনে করা হত। অনেক সীলমোহরেও বট গাছের ছবি আছে। তাতে মনে হয় বট গাছ তখন থেকেই পবিত্র বলে মনে করা হত।

হরপ্পায় মৃতদেহ দাহ করা হত। অনেকে মৃত দেহ কবর দিতেন। আবার কোন পাত্রে দেহ রেখে সমাধিস্থ করত, কবরে অনেক সময় গহনা পত্র, গৃহস্থালীর জিনিসপত্রও থাকত। মনে হয় মৃতের ব্যবহারের জন্য এসব দেওয়া হত।

ষষ্ঠ পাঠ

ধনী দরিদ্রের শ্রেণীভেদের প্রমাণ

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির মধ্যে হরপ্পা সভ্যতাই হচ্ছে আয়তনের দিক থেকে সবচেয়ে বিস্তৃত। এই বিশাল সাম্রাজ্য

শাসিত হ'ত মহেনজোদড়ো আর হরপ্পা—দুই রাজধানী থেকে। এই সাম্রাজ্য শাসনের ব্যয় কম ছিল না। সে অর্থ সংগ্রহ করা হত উদ্বৃত্ত শস্যের কর আর বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত থেকে।

ব্যবসা-বাণিজ্য, কারিগরী শিল্প, গৃহস্থালীর জিনিসপত্র, এবং সমাজের আর্থিক অবস্থা দেখে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে সিন্ধু সভ্যতার যুগের সমাজ ধনী, দরিদ্র এবং দাস এই সব বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

এই দক্ষ সভ্যতার সমাজের যে পরিচয় পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় যে ধনী দরিদ্রদের মধ্যে অবস্থার অনেক পার্থক্য ছিল। যে সব অলঙ্কার পাওয়া গেছে তা থেকেও ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য বোঝা যায়। ধনীদের অলঙ্কার সোনা, রূপার; আর দরিদ্রদের অলঙ্কার শাঁখের, মাটির নানা বিচিত্র জিনিসের, নয়ত ব্রোঞ্জের। নগর বিন্যাস থেকেও দেখা গেছে যে ধনীদের ঘরবাড়ির জায়গা ছিল দুর্গ-অঞ্চলে। আর দরিদ্রদের বসতি ছিল শহরের বাইরে। নয়ত প্রতিটি বাড়ির সঙ্গে যুক্ত ছোট ছোট খুপরীতে।

এত দক্ষ সমাজ ভালভাবে চালনার জন্য নিশ্চয় বিশেষ দক্ষ শাসনব্যবস্থাও ছিল। নানা শ্রেণীতে বিভক্ত এমন সমাজ সুশৃঙ্খল ভাবে শাসন করা খুব সহজ কাজ নয়। কালক্রমে প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এই সভ্যতার অবসান ঘটেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চীনে সভ্যতার আলো

প্রথম পাঠ

চীনে সভ্যতার প্রথম উদয় হল কোথায়

হোয়াং-হো-ইয়াং সী কিয়াংঃ হিমালয় পেরিয়ে মহাচীন। তারও উত্তরে চীনের পীত নদী বা হোয়াংহো, আর মধ্যে দক্ষিণ চীনে ইয়াং সী কিয়াং নদী। ইয়াং সী নদীর দক্ষিণ দিকে ছড়িয়ে রয়েছে চীনের বিশাল সমভূমি। ঐ অঞ্চলের আবহাওয়াও মৃদু। এমন জায়গাতেই

অন্যত্র প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছে। কিন্তু মজার কথা এই যে— চীনের এই অঞ্চলে প্রথম সভ্যতা গড়ে ওঠেনি। সে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল উত্তরের অশ্রুনদী হোয়াংহো বা পীত নদীর উপত্যকায়। হোয়াংহো কে পীত নদী বলার কারণ হচ্ছে যে উত্তর-পূর্ব চীনের
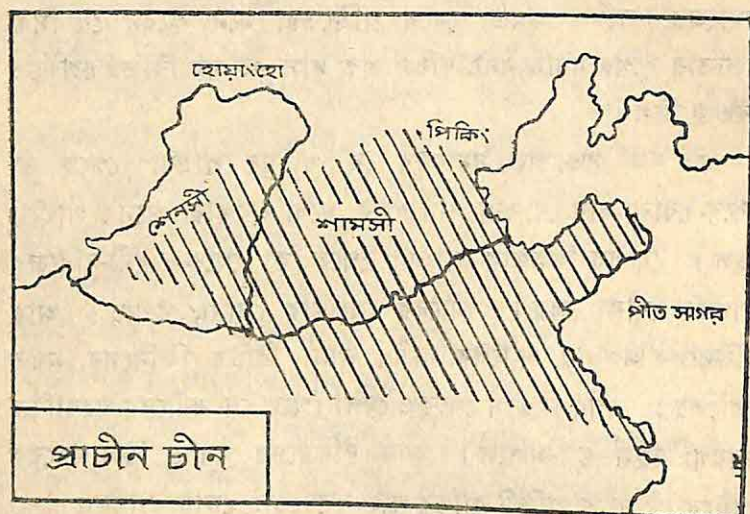
পাহাড়ী অঞ্চলে ঐ নদীর জল ঘোলাটে হলদে দেখায়। মিশরের নীল নদের মত প্রতি বৎসর হোয়াংহো নদীতেও বন্যা হত। ঐ নদীর সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে সেজন্য হোয়াংহো উপত্যকার মানুষ প্রথম সভ্যতার সৃষ্টি করেছিলেন।

চীনের প্রাচীন জীবন

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে চীনের প্রথম রাজবংশের নাম **সাং** বা **ইন্**। সে ২০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের কথা। এঁদের রাজধানী এখন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। রাজধানী যেখানে ছিল তাকে বলা হয় **ইন-এর স্তূপ**। এই স্তূপ খনন করে প্রাচীন যুগের দাসশ্রমে পুষ্ট চীনের জীবনযাত্রার অনেক পরিচয় পাওয়া গেছে।

লিপি আবিষ্কার : স্তূপের চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল কচ্ছপের খোলা। কচ্ছপের খোলার গায়ে আঁকা দাগ থেকেই নাকি কালক্রমে চীনের লিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল।

সমাজ জীবন: প্রাচীন চীনের মানুষ গম, ভুট্টা, ধান, তরি-তরকারী উৎপাদন ও পশুপালন করতেন। রেশমগুটির চাষ করে তাঁরা চমৎকার সিল্কের কাপড় বুনতেন। চীনের মানুষের হাতের কাজ ছিল খুব ভাল। ব্রোঞ্জের উপর এনামেল করা মাটির ও পাথরের বাসন কোসনও ছিল চমৎকার।

ওদেশের অনেক মানুষ নিজেদের পূর্বপুরুষদের পূজা করতেন।
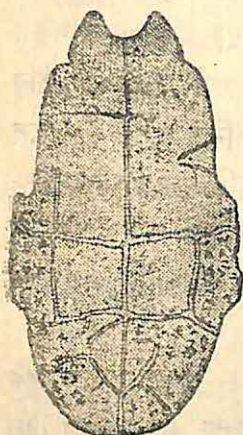
কচ্ছপের খোলায় লেখা লিপি। চীনের প্রাচীন লিপি। চীনের আধুনিক লিপি।

তা ছাড়াও তাঁরা আমাদের মত নানা দেবদেবীর ও প্রকৃতির পূজা করতেন।

প্রাচীন চীনের সামাজিক জীবন (কাল্পনিক)

প্রাচীন চীনের সমাজে কৃষক, কারিগর, ভূমি দাস, জমিদার

এবং দাস শ্রেণীর লোক বাস করতেন। সমাজ ব্যবস্থায় রাজা ছিলেন প্রধান শাসক ও পুরোহিত। অভিজাত জমিদারগণ গোটা দেশের জমিজমার অধিকারী ছিলেন। দাসশ্রমই ছিল উৎপাদনের প্রধান অঙ্গ।

দ্বিতীয় পাঠ
উপকথার চীন

প্রথম মানুষ পানকু : অনেক আগের চীনের উপকথায় আছে যে লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে চীনের প্রথম মানুষ ছিলেন **পানকু**। ১৮০০ হাজার বছর ধরে তিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেন। তাঁর নিঃশ্বাসে হয় বাতাস আর মেঘ ; অস্থিতে যত খনিজ পদার্থ ; মাংসে মাটি ; চুল থেকে গাছপালা ; এবং শিরায় উপশিরায় যত নদনদী ; আর গায়ের উকুন থেকে মানুষ। তিনিই ছিলেন পৃথিবীর প্রথম রাজা। তাঁর পর শুরু হয় তাঁর তের ভাইয়ের-স্বর্গীয় সম্রাটের রাজত্ব।

চীনের বন্যা সম্বন্ধেও একটি কিম্বদন্তী আছে। একদা দেবতাদের রাগ হয় সংসার ধ্বংস করে ফেলার জন্যে। সেজন্য দিনের পর দিন চলল বৃষ্টি। সারা পৃথিবী গেল জলে ডুবে। মানুষ গিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় বাসা বাঁধলেন। দশ বৎসরের মধ্যে সে জল কমল না। ওয়াই-ই নামে একজন লোক দিন রাত অবিরাম কাজ করে খাল কেটে, মাটি খুঁড়ে নদীর তলা আরও গভীর করতে লাগলেন। অবশেষে বন্যার জল গেল সরে। মানুষ আবার নীচে নেমে এলেন। মানুষের পরিশ্রমের জয়ের কথা বলা হয়েছে এই কিম্বদন্তীতে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
নদী-মাতৃক সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য
প্রথম পাঠ
সমাজ জীবন

নদী মাতৃক সভ্যতাগুলি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিবেশে রচিত। তবুও তাদের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল।

জীবন সংগ্রামের মিল ঃ এইসব অঞ্চলের নদীর উপত্যকাগুলিতে বন্যার জল চাষের জমি উর্বর করে দেয়। তাতে কৃষিকাজ সহজে সম্ভব। আবার খুব সহজে জীবিকা অর্জন করতে পারলে মানুষ অলস হয়ে পড়ে। তাতে জীবনে উন্নতি হয় না। কিন্তু বন্যার জল আটকাতে গিয়ে ঐসব অঞ্চলের মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। সেজন্য বুদ্ধির জোরে মানুষ উন্নতির নানা পথ বের করেছেন।

শ্রেণীভেদ ঃ নদীমাতৃক সভ্যতার সব কটি সমাজে ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ ঘটেছিল। মিশর, মেসোপটেমিয়া, সিন্ধু অঞ্চল, চীন সর্বত্রই সমাজে উচ্চনীচ ভেদ আর দাস ব্যবস্থা দেখা গেছে।

ধর্মচেতনা ঃ নদীমাতৃক সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে প্রায় একই রকম ধর্মচেতনা দেখা যায়। প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিস—সূর্য, চন্দ্র, বজ্র, বিদ্যুৎ, মেঘ, বৃষ্টি সব কিছুকে অলৌকিক শক্তির আশ্রয় বলে তাঁরা মনে করতেন।

মৃত্যু সম্বন্ধেও এইসব দেশের ধারণা প্রায় একই ধরনের ছিল। মৃত্যুর পরেও জীবন আছে। এ জীবনে মানুষ যা ব্যবহার করতেন—মৃত্যুর পরেও সে সব জিনিস তাঁর কাজে লাগবে এই ছিল ধারনা।

আমোদ-প্রমোদ শিল্পকলা ঃ সবকটি নদীমাতৃক অঞ্চলের মানুষ নানা আমোদ প্রমোদ শিল্পচর্চা, আর জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করতেন।

লিপি আবিষ্কার ঃ মেসোপটেমিয়া থেকে শুরু করে মিশর, সিন্ধু-অঞ্চল, চীন সর্বত্র মুখের ভাষার লিখিতরূপ থেকেই লিপি আবিষ্কার হয়েছিল। তবে সে লিপি এক এক দেশে এক এক রকম ছিল। অন্যান্য দেশের লিপির অর্থ বুঝাতে পারা গেলেও সিন্ধু অঞ্চলের লিপির অর্থ এখনো জানা যায় নি। লিপি আবিষ্কারের পর থেকেই নথীবদ্ধ ইতিহাসের শুরু।

দ্বিতীয় পাঠ
অর্থ নৈতিক জীবন

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ঃ নদীমাতৃক সভ্যতার জায়গায় সমস্ত উন্নতির মূলে রয়েছে উদ্বৃত্ত বা বাড়তি ফসল উৎপাদন। নিজেদের

প্রতিদিনের প্রয়োজন মেটানোর চাইতেও বেশী ফসল এঁরা উৎপদান করতেন। প্রথমে সেই উদ্বৃত্ত ফসল একটু বেশী অবস্থাপন্ন পরিবার নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সঞ্চয় করত। তারপর কারিগরী ও অন্য কাজে বিশেষীকরণ ঘটলে সে ফসল বিনিময় করে ব্যবসা-বাণিজ্যের আরম্ভ হয়। সব সভ্যতাতে ছিল কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি। আজও আমাদের দেশের সর্বত্র কৃষিই হচ্ছে যত উন্নতির মূলে।

নদীতীরে ও সমুদ্রের তীরে বাণিজ্য ঃ কৃষির ফসল প্রধানত দেশের মধ্যে বিনিময় করে উন্নত নগর সভ্যতার লোকের নিজেদের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতেন। কিন্তু নদীপথে নৌকায় বা জাহাজে করে এক দেশের পণ্য অন্যদেশেও রপ্তানি হত। বণিক ও সওদাগরেরা যে সব পণ্যদ্রব্য বিদেশে নিয়ে যেতেন তার ওপর নিজেদের ছাপ বা সীল মোহর মেরে দিতেন।

শাসন-ব্যবস্থা, রাজা ও রাজত্ব ঃ বিভিন্ন নদীমাতৃক সভ্যতার সর্বত্র দক্ষ শাসন ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। যে সভ্যতা যত দক্ষ আর বিস্তৃত সে সভ্যতার শাসন-ব্যবস্থাও ছিল তেমনি উন্নত। তবে সব সভ্যতার মধ্যেই উদ্বৃত্ত ফসল ও বাণিজ্যের পণ্য দ্রব্য থেকে রাজস্ব আদায় করে কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। হয়ত রাজাই ছিলেন প্রধান শাসক ; নয়ত রাজার সঙ্গে প্রধান পুরোহিতও শাসন করতেন। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার, শাসন কাজ, ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা এবং বিভিন্ন স্থানের সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য লিপির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। আর থাকতেন অসংখ্য সৈন্য সামন্ত ও রাজকর্মচারী এবং কৃষক, কারিগর ও অন্যান্য বৃত্তিজীবী। এঁদের নিয়েই গড়ে উঠত রাষ্ট্রের কাঠামো।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম ভাগ

প্রথম পাঠ

লৌহ-আবিষ্কার ও তার প্রভাব

কারা আবিষ্কার করলেন ঃ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ ২০০০ থেকে ১৫০০ বছরের মধ্যে মিশর, মেসোপটেমিয়া আর পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাট রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে লৌহ আবিষ্কারের ফলে।

আর্মেনীয় পাহাড় অঞ্চলের হিট্টাইট জাতি সর্বপ্রথম লালচে পাথর গলিয়ে লৌহ উৎপাদন করতে শিখলেন। মিশরে হিকসসরা, মেসোপটেমিয়ার আসিরীয়রা আর ভারতের আর্যরা লৌহ যুগের মানুষ।

আবিষ্কারের প্রভাব ঃ লৌহ উৎপাদনের ফলে তাম্র-ব্রোঞ্জযুগের অস্ত্রশস্ত্রের চেয়ে অনেক শক্ত ও ধারালো অস্ত্রশস্ত্র মানুষের হাতে এল। মানুষ বনজঙ্গল কেটে বসতি গড়বার আরও ভাল উপায় পেলেন। সমস্ত নদীমাতৃক সভ্যতার ক্ষেত্রেও লৌহ আবিষ্কারের ফলে জীবন-ধারা দ্রুত বদলে যেতে লাগল। বড় বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল।

দ্বিতীয় পাঠ

সামাজিক বৈশিষ্ট্য

সমাজের পরিবর্তন : লৌহ যুগের সমাজে নানা পরিবর্তন হয়েছে। উৎপাদন ব্যবস্থায় মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের প্রাধান্য বেড়ে গিয়েছিল। এখনকার সমাজ হল **পিতৃতান্ত্রিক**। পিতাই পরিবারের প্রধান হলেন। এ যুগে যুদ্ধ বিগ্রহ বাড়ায় যুদ্ধ বন্দীদের সংখ্যাও বাড়ে। তার ফলে দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই দাসদের দিয়ে তখন নতুন নতুন অঞ্চলে কৃষি, পশু পালনের প্রসার ঘটে। দাসশ্রম উৎপাদনের একটা প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে।

লৌহ যুগে আগের সমাজের কাজের বিশেষীকরণ থেকে বৃত্তি ভেদে জাতিভেদ দেখা দেয়। যাঁরা পরিশ্রম করে ফসল ও পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতেন তাঁদের নিয়ে একটা শ্রেণী গঠিত হয়। যাঁরা ধর্মচর্চা করতেন তাঁরা গঠন করেন অন্য এক শ্রেণী। আর যাঁরা যুদ্ধ-বিগ্রহ করতেন তাঁরা হলেন আর এক শ্রেণী। দাস আর বন্দীরা সমাজের অন্যদের সেবা করতে বাধ্য হলেন।

আর্থিক বৈশিষ্ট্য : লৌহযুগের মানুষ অনেক দূর দূরান্তরে ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। ধীরে ধীরে সব দেশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য সোনা-রূপার একরকম মুদ্রা তখনকার সকলের মধ্যে প্রচলিত হয়। লৌহ যুগের প্রথম ব্যবসায়ীরা ছিলেন বড় বড় জমির মালিক। তাঁদের যেমন অবসর ছিল তেমনি ছিল বাড়তি সম্পদ। সেই সম্পদ তাঁরা ব্যবসায়ে খাটাতেন। লৌহ যুগে কাজ কর্মেরও রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মর্যাদার পরিবর্তন হয়। এঁদের সকলেরই আলাদা আলাদা গোষ্ঠী বা গিল্ড গড়ে উঠেছিল।

রাজা আর রাজত্বের পদের উদ্ভব

লৌহ যুগের আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে রাজপদের উদ্ভব। লৌহ যুগে পরিবারের প্রধান ছিলেন পিতা। বিভিন্ন পরিবার নিয়ে কুল গঠিত হত। সে কুলের প্রধান প্রথম যুগে শুধুমাত্র যুদ্ধ

বিগ্রহ আর অন্য সময়ের নেতামাত্র ছিলেন। কালক্রমে সেই নেতা নিজে রাজপদ দখল করে বসলেন। পরে সেই পদ হয়ে উঠল বংশ পরম্পরাগত। নেতাদের এই রাজপদ লাভে পুরোহিতরা যথেষ্ট সাহায্য করতেন।

ক্রমে ক্রমে পুরোহিতরা রাজাকে ভগবানের অংশ বলে প্রচার করলেন। রাজার সিংহাসন বংশগত হয়ে পড়ল। তখন পুরোহিতদের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেল। তাঁরা রাজাকে অভিষেক করাতেন।

এ যুগের ইতিহাসে পড়তে হবে বাবিলন, মিশরের নতুন সাম্রাজ্যের যুগ, ইরাণ, ইহুদী, গ্রীস, রোম চীনের চীন রাজত্ব ও ভারতের কাহিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাবিলন

প্রথম পাঠ

কৃষি কাজ, বাণিজ্য, মন্দির ও পুরোহিত

আড়াই হাজার খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে আক্কাদ বংশের রাজা সারগণ দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় ইউফ্রেটিস নদীর তীরে বাবিলন নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চারদিকে বিস্তৃত উর্বর ক্ষেত্রের মধ্যে বাবিলনের

বাবিলনের সমাজের একটি দৃশ্য (কাল্পনিক)

অবস্থান ছিল খুব সুবিধার। সেখানে নদীপথে সওদাগরেরা বড় বড় নৌকায় নানা জিনিস আনতেন যে-সব জিনিসের খুব চাহিদা ছিল।

দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার প্রধান বাণিজ্য পথ ছিল বাবিলনের মধ্যে দিয়ে। খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ অষ্টাদশ শতাব্দীতে সম্রাট হাম্বুরাবির রাজত্বে এটি বিখ্যাত নগরে পরিণত হয়।

কৃষিকাজ ও বাণিজ্য: বাবিলন ছিল একটি নগর রাষ্ট্র। এ-রাষ্ট্রের মূল উপজীবিকা ছিল কৃষি। নদীর মোহনা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলে জমি ছিল খুব উর্বর। তাই কৃষিতে সহজেই উদ্বৃত্ত ফসল উৎপন্ন হত। কৃষির উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করে নগর রাষ্ট্রের শাসনের ব্যয় বহন করা হত। তাছাড়া বাবিলনের হস্ত-শিল্পের খ্যাতিও ছিল দেশ-বিদেশে। নদী ও স্থল উভয় পথেই বাণিজ্য চলত। বাণিজ্য হত মিশর, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের নানা উপনিবেশের সঙ্গে।

মন্দির ও পুরোহিত: বাবিলন ছিল মন্দির আর পুরোহিতের নগর। বিরাট বিরাট মন্দির সে নগরে নির্মিত হয়েছিল। উঁচু পাহাড়ে ওঠার মত ঘোরানো পথ দিয়ে মন্দিরে উঠতে হত।
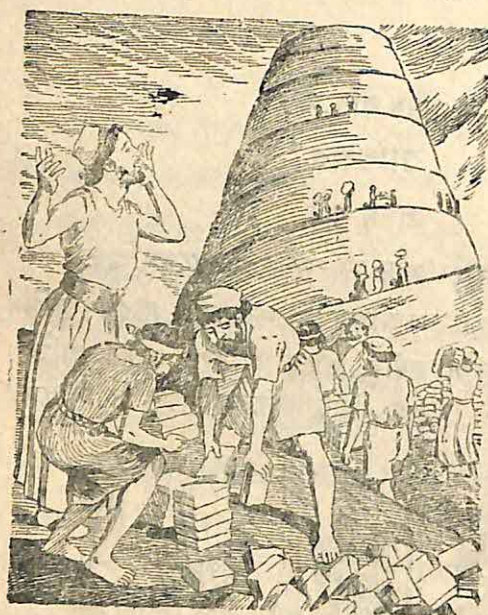
বাবিলনের ঘোরানো মিনার

বাবিলনের নগর দেবতা ছাড়া বাবিলনের ঘরে ঘরেও মূর্তি পূজা হত। পূজোর সময় যে সব অর্ঘ্য ও সম্পদ উপহার দেওয়া হত তা জমা হত মন্দির আর পুরোহিতের কোষাগারে। পুরোহিতরা সে টাকা খাটিয়ে দাসশ্রমের সাহায্যে প্রচুর আয় করতেন ও তাঁদের ধনসম্পদের বলে পুরোহিতরা রাষ্ট্রের মধ্যে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন। এক সম্রাট ছিলেন

নেবুকাদনেজ্জার। তার সময়ে বাবিলন হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর নগর। রোদে পোড়ানো ইঁটে তৈরী প্রাচীরে সারা নগর ঘেরা ছিল। তাতে প্রবেশের জন্য ছিল আটটি সিংহদ্বার। সবচেয়ে জমকালো সিংহদ্বার ছিল দেবী **ইস্থার**-এর নামে উৎসর্গ করা। বাবিলনের ঠিক মাঝখানে ছিল নগর দেবতা মারডকের বিরাট মন্দির। অনেক উঁচু এক মিনার ছিল সে মন্দিরে। মারডক মন্দিরের পুরোহিতের মর্যাদা ছিল সবচেয়ে বেশী। রাজপ্রাসাদের এক কোণায় ছিল পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য শূন্যোদ্যান।

দ্বিতীয় পাঠ
বাবিলনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি

বাবিলনীয় যুগে বিজ্ঞানের বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল। বাবিলনীয়-গণ পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতিতে অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের গণনার একক ছিল ৬০। আমরা আজও সময়ের হিসাবের ক্ষেত্রে ৬০ সেকেণ্ডে এক মিনিট, ৬০ মিনিটে এক ঘণ্টা বলি। তাঁরা সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রের গতি গণনা করতে পারতেন। আর জ্যোতিষশাস্ত্রের মত ভবিষ্যদ্বাণীও করতে জানতেন।

বাবিলনে শিশুদের পাঠশালা ছিল। সেখানে তাদের পাটী-গণিত, লেখা ও পড়াশুনা করানো হত। পাতলা মাটির পাতের উপর কাঠের কীলক দিয়ে তারা লিখতো। আজ থেকে প্রায় ৪০০০ বছর আগের একটি ছাত্রের লেখার অমন খাতাও আবিষ্কৃত হয়েছে।

তৃতীয় পাঠ
হাম্মুরাবির বিধান

বাবিলনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন **হাম্মুরাবি**। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতে তিনি রাজত্ব করতেন। তিনি আসিরীয়া ও গোটা মেসোপটেমিয়া জয় করেছিলেন। তিনি শুধু দিগ্বিজয়ী ছিলেন না। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরে তিনি প্রজাদের শাসনের জন্য ন্যায়বিধান রচনায় মন দেন। মাটির পাতের উপর চিঠি লিখে তিনি তাঁর কর্ম-চারীদের প্রজামঙ্গলের জন্য নানা কাজের নির্দেশ দিতেন।

তাছাড়া পাথরে খোদাই করা একটি ছবি আছে সম্রাটের। তাতে দেখা যায় সম্রাট হাম্বুরাবি সূর্যদেবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ছবির নীচে খোদাই করা রয়েছে কতকগুলি বিধান। প্রজাদের কল্যাণের জন্য ঐ বিধান তিনি সূর্যদেবের কাছ থেকে লাভ করেন বলে তাঁর বিশ্বাস। পৃথিবীতে এটাই সর্বপ্রথম লিখিত বিধান।

এই বিধানে ছিল কিভাবে সেচ খালের তদারক করতে হবে। সমস্ত জাতির জীবন সেচ খালের উপর নির্ভর করত বলে ঐ আইন অত্যন্ত কঠোর ছিল। রাজস্ব দান, মহাজনের ঋণ শোধ করা, কেনা-কাটা, বিবাহ, সম্পত্তি হস্তান্তর প্রভৃতি সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট বিধান ছিল। হাম্বুরাবির বিধানে দাস ও ধনী-দরিদ্রে বিভক্ত সমাজের ছবি দেখা যায়। দাসদের স্থাবর সম্পত্তির মত দেখা হত। কেউ দাসদের মুক্তি দেবার চেষ্টা করলে তাঁর শাস্তি হত মৃত্যু। ঋণ শোধেরও কঠোর শর্ত ছিল। উচ্চশ্রেণীর গায়ে হাত তুললেও তাঁকে চাবুক মারার বিধান ছিল। পুরোহিত, জমিদার, বণিক, ভূমিদাস ও দাস শ্রেণীতে বিভক্ত বাবিলনের সমাজের চিত্র এই আইনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হাম্বুরাবির আইন লাভ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে মিশর

প্রথম পাঠ

বিজিত উপনিবেশগুলি

লৌহ যুগে মিশরে চলছিল নতুন রাজত্বের কাল। কায়রোর ৪০০ মাইল উত্তরে নীলনদ হঠাৎ অত্যন্ত প্রশস্ত হয়েছে। সেখানে

এযুগের ফেয়ারোরা **থীবস্** নামে রাজধানী পত্তন করেন। মিশরের সবচেয়ে গৌরবময় সাম্রাজ্যের কাহিনী ১৬০০ থেকে ১২০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত থীবসেই রচিত হয়েছে। সে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল পূর্বে ইউফ্রেটিস নদীর পাড় থেকে নীল-নদের কয়েকটি জলপ্রপাত পর্যন্ত।

তৃতীয় থুটমোস্

নতুন সাম্রাজ্যের যুগ ঃ নতুন সাম্রাজ্যের যুগের এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন **প্রথম থুটমোস্**। তিনিই প্রথম সমুদ্রপারে অভিযান চালিয়ে এশিয়ার নানাস্থান জয় করে মিশরের অধীনে আনেন। আর প্রাচীন যুগের মত শুধু মাত্র লুণ্ঠন করে তিনি ক্ষান্ত হননি। এগুলিকে রীতিমত উপনিবেশে পরিণত করেছিলেন। এখান থেকে আদায় করতেন রাজস্ব, শস্য, কারিগরি জিনিস পত্র। দিগ্বিজয়ী **তৃতীয় থুটমোসের** সময় তাঁর ৫০ বছরের রাজত্বকালে পশ্চিম এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল আর ভূমধ্যসাগরের ঈজীয় দ্বীপপুঞ্জ মিশরের অধীন হয়েছিল।

পরবর্তীকালে আসিরীয় ও পারসীকগণ এবং তারপরে ৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার মিশর জয় করে তাকে একটি প্রদেশে পরিণত করেছিলেন।

উপনিবেশ

ভূমধ্যসাগরের দুই তীরের প্রধান প্রধান বন্দরেই মিশরের উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল জয় করার পিছনে মিশরীয় নৌ-বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল ঐ অঞ্চলের ধাতু এনে মিশরের ধাতুশিল্পের বিস্তার ঘটানো। উত্তর ও পূর্বের উপনিবেশ ছিল ফিনিসীয়া। অন্যান্য উপনিবেশের মধ্যে প্রধান ছিল সিরিয়া,

নুবিয়া, প্যালেষ্টাইন, আসিরীয়া, বাবিলন, লেবানন ও পারস্য। এ ছাড়া ক্রীট, ঈজীয় দ্বীপপুঞ্জ, গ্রীস, সাইপ্রাস প্রভৃতি মিশরের উপনিবেশ ছিল। মিশরের উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এগুলিও পরে বিখ্যাত হয়েছিল।

দ্বিতীয় পাঠ

পুরোহিততন্ত্র

প্রাচীন কালের পিরামিডগুলির সঙ্গেও মন্দির জড়িত থাকত। নানা নগর থেকে সে পিরামিডের মন্দিরগুলির ব্যয় ও শাসন পরিচালনার জন্য অর্থ যোগাড় করা হত। তাছাড়া অভিজাতদেরও সমাধির পাশে উপাসনার স্থান থাকত। পুরোহিতেরা এখানে মমীদের জন্য প্রতিদিন খাদ্য ও পানীয় দান করতেন।

কারনাকের মন্দির ও অন্যান্য মন্দিরে অসংখ্য পুরোহিত বাস করতেন। তাঁরা যে শুধু মন্দিরের পূজা অর্চনাই দেখতেন তা নয়। সাধারণ মানুষের জীবনও তাঁরা নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন। পুরোহিতদের যাদুশক্তি ছিল বলে সাধারণ লোকের ধারণা থাকায় সকলে তাঁদের ভয় করতেন। তাছাড়া পুরোহিতদের ধন ঐশ্বর্যও কম ছিল না। সেই ধনসম্পদ খাটিয়ে তাঁরা গরীব ও দাস শ্রমে চাষ বাস, কারিগরী, পশু পালন ও উৎপাদন আর মহাজনী করতেন। বড় কথা হচ্ছে পুরোহিতরাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতেন বলে সকলকেই ধর্মকর্ম ইত্যাদির জন্য তাঁদের কাছে আসতে হত। হিকসাসদের অধীনতার সময় থেকে পুরোহিতদের ক্ষমতা বাড়তে থাকে। পরলোক সম্বন্ধে মানুষের ভয় ভীতির সুযোগ নিয়ে তাঁরা টাকা পয়সা নিয়ে রক্ষা কবচ প্রভৃতি বিক্রী করতেন। সম্রাট আখনাটন-এর সঙ্গে পুরোহিততন্ত্রে একবার খুব বিরোধ বাধে। তিনি সমস্ত মন্দির থেকে পুরোহিতদের দূর করে দেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে পুরোহিততন্ত্র এবং কুসংস্কারের প্রতাপ আবার বেড়ে গিয়েছিল। শেষের দিকে পুরোহিতদের নির্দেশ মত রাজার যত আদেশ জারী করা হত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ইরানের সভ্যতা

প্রথম পাঠ

পারস্যের অভ্যুত্থান

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার পশ্চিম সীমানা গিয়ে মিশেছে যে দেশে তার এখনকার নাম ইরাণ। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নামে ছিল এদেশের পরিচয়। মেসোপটেমিয়া বিজয়ী আসিরীয়রা একবার এদেশ জয় করেছিলেন। তখন এদেশের নাম হয় আসিরীয়া। আসিরীয়দের পরে এদেশের নাম হয় মিডিয়া। তারপরে স্থানীয় ফারসী জাতির অভ্যুত্থানের পর এর নাম হয় "পারস্য"—আর এখন ইরাণ। এদেশবাসীরা প্রাচীন কালে জগত কাঁপানো ইতিহাস রচনা করেছিলেন। এঁদের গৌরবের যুগের আরম্ভ মহান কাইরাস থেকে।

মহান কাইরাস : ফারসীদের রাজা কাইরাস ৬০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মিডিয়া সাম্রাজ্য উচ্ছেদ করে দেশের সমস্ত কুলগুলিকে নিয়ে মিলিয়ে এক ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কুড়ি বছর ধরে নানা দেশে অভিযান চালিয়ে তিনি ভারতের পশ্চিম সীমান্ত থেকে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর এবং মিশরের দক্ষিণ অঞ্চল অবধি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। কাইরাসের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য **আকামেনীয়** সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। প্রায় দুশো বছর এ সাম্রাজ্য সগৌরবে টিকে ছিল। তাঁর পুত্র ক্যাম্বিশেস সমস্ত মিশর জয় করেন।

প্রথম দারিয়ুস : এর পর শুরু হল দিগ্বীজয়ী দারিয়ুসের যুগ। সে ৫২১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের কথা। সিন্ধুনদের পশ্চিম অঞ্চল থেকে রাশিয়ার ভলগা নদীর তীর পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের তিনি অধীশ্বর হন। তাঁর সাম্রাজ্য জয়ের বিস্ময়কর কাহিনী যাতে কেউ না ভুলে যায় এজন্য তিনি পারস্যে যাবার প্রধান রাস্তার উপর বাহিস্তান পাহাড়ের গায়ে দুশো ফুট উঁচুতে তিনটি ভাষায় নিজের

বিজয় গাঁথা খোদাই করে দেন। সিন্ধুনদের পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। সিন্ধু প্রদেশ নিয়ে মোট ২০টি

প্রদেশে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সম্রাট প্রথম দারিয়ুস এর পর গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। বিপুল বাহিনী নিয়ে

গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযান করেও **ম্যারাথনের** উপকূলের যুদ্ধে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল।

জারেক্সেসের অভিযানঃ প্রথম দারিয়ুসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জারেক্সেস ভারতীয় সৈন্যসহ দুই লক্ষ বাহিনী নিয়ে গ্রীস আক্রমণ করেন। সম্রাট স্বয়ং সিংহাসনে বসে সৈন্য পারাপার দেখেন।
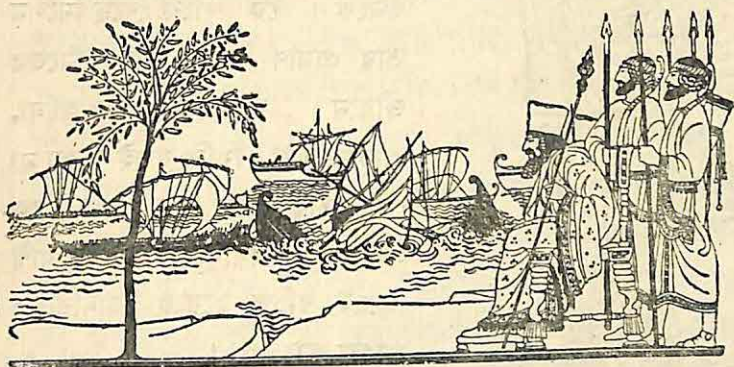
জারেক্সেস সৈন্য পারাপার দেখছেন

থার্মপলির উপত্যকায় গ্রীকদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু পরে সালামিসের নৌযুদ্ধে পরাজিত হয়ে জারেক্সেস ফিরে আসতে বাধ্য হন। গ্রীকবীর মহান আলেকজাণ্ডারই এর পর পারস্য জয় করেছিলেন।

দ্বিতীয় পাঠ

জরাথুষ্ট্র কহেন

পারস্যের যখন অভ্যুদয় ঘটে তখন তাঁদের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিলিয়ে ছিলেন **জরাথুষ্ট্র**। তিনি শেখালেন পৃথিবী জুড়ে সর্বত্র মঙ্গল আর অমঙ্গলের মধ্যে সংগ্রাম চলছে। **আহুর মাজদা** হলেন জ্ঞানের দেবতা, স্বর্গের অধিপতি। পৃথিবীতে যতকিছু ভাল তারই প্রতীক হলেন তিনি। তাঁকে ঘিরে থাকেন একদল সৎ সঙ্গী। এঁদের সাহায্যে

তিনি দিনরাত যুদ্ধ করে চলেছেন পৃথিবীর অজ্ঞানের অন্ধকার আর মৃত্যুর অধিপতি **আহ্রিমান**-এর সঙ্গে। ইনি জগতের যত কিছু অমঙ্গল তার প্রতীক। মানুষকে বেছে নিতে হবে এঁদের মধ্যে এক-জনকে। কে কাকে বেছে নিলেন তার প্রমাণ হবে তাঁর নিজের জীবনে। যাগ-যজ্ঞ, পূজা-অর্চনা, আচার-নিষ্ঠা, যিনি যতই করুন না কেন তার চেয়ে বড় কথা হল সদাচার। জরাথুষ্ট্রের এই সব বাণী নিয়েই রচিত হয়েছে ইরানীয়দের ধর্মগ্রন্থ **আবেস্তা**।

জরাথুষ্ট্র

ইরানীয়গণ ছিলেন অগ্নি উপাসক। তাঁরা যে সত্যিসত্যই অগ্নি দেবতার পূজা করেন তা কিন্তু নয়। তবে আগুন ছিল তাঁদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র। ভারতের পার্সীরা এঁদের বংশধর।

প্রথম পাঠ

উদ্বাস্তু ইহুদী

মিশরে ইহুদীদের নির্বাসনের জীবন

মেসোপটেমিয়ার কথা বলার পরে বলা হয়েছে মিশরের কাহিনী। কিন্তু এ দু দেশের মাঝখানে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব সীমায় ছোট্ট একফালি পাহাড়ে ঘেরা দেশের লোকের কথা এবার বলব। এই উর্বর দেশটার নাম **ক্যানান** বা **প্যালেস্টাইন**। আরব মরুভূমির যাযাবর জাতিদের তাড়িয়ে সেমাইট জাতির অন্তর্গত **হিব্রু** বা **ইহুদী** নামে আর এক গোষ্ঠীর মানুষ ক্যানান আক্রমণ করেন।

আব্রাহামের মিশর যাত্রা : হিব্রুরা আক্রমণ করলে ক্যানান-বাসীদের সঙ্গে বহুদিন ধরে চলে তাঁদের সংগ্রাম। সে যুদ্ধ চলার সময়েই ক্যানান অঞ্চলে দেখা দেয় ঘোর দুর্ভিক্ষ। প্রায় ২০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের কথা। ইহুদী জাতির পূর্বপুরুষ **আব্রাহাম**-এর নেতৃত্বে একদল ইহুদী তখন খাদ্যের সন্ধানে চলে গেলেন আরও পশ্চিমে সুসভ্য মিশর দেশে। প্রায় একশ বছর তাঁদের মিশরে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটে। কিন্তু তার পরেই তাঁদের কর্ম দক্ষতা আর ধন সম্পদ দেখে মিশরের ফেয়ারোর ভীষণ হিংসে হয়। তিনি তখন ঐ ইহুদীদের দাসের মত খাটাতে আরম্ভ করেন। জোর করে মিশরের পিরামিড এবং যত মন্দির নির্মাণের কাজে তিনি তাঁদের লাগিয়ে দিলেন। আর নির্মম অত্যাচার চালালেন ইহুদীদের উপর।

ফেয়ারোর এই অত্যাচার ইহুদীদের পক্ষে ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে। তবে এই অত্যাচারের ফলে ইহুদীদের মধ্যে ঐক্য বোধ জাগে এবং তাঁরা এক মিলিত জাতিতে পরিণত হন। নীল-নদের প্রভুদের উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ইহুদীরা সভ্যতার অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। সব চেয়ে বড় কথা তাঁরা উন্নত প্রথায় কৃষিকাজ শিখলেন। আর শিখলেন সমাজ জীবনে আইন শৃঙ্খলার গুরুত্ব। বাইবেলের প্রাচীন খণ্ডে ইহুদীদের দাস জীবনের কাহিনী আর তাঁদের দুঃখের কথা লেখা আছে। তা থেকে জানা যায় যে ইহুদীদের সে গ্লানি থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন **মুশা** বা **মোজেজ**।

দ্বিতীয় পাঠ

মোজেজ-এর মুক্তিযাত্রা

আব্রাহামের কয়েকপুরুষ পরে মোজেজ ছিলেন হিব্রুদের শ্রেষ্ঠ অবতার। তিনি হিব্রুদের মধ্যে প্রথম আইন ও বিধান রচনা করেন। বাইবেলে বর্ণিত মোজেজ-এর জীবন আশ্চর্য কাহিনীতে ভরা।

হিব্রুরা যখন মিশরে ছিলেন তখন এক ফেয়ারো আদেশ দেন যে, কোন হিব্রুর ছেলে হলেই তাকে জলে ভাসিয়ে দিতে হবে। কিন্তু

মোজেজ-এর মাতা ফেয়ারোর আদেশ না মেনে তিনমাস শিশুটিকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তারপর তাকে একটা ঝুড়ির মধ্যে ভাল করে শুইয়ে পাড়ের নলখাগড়ার ঝোপের মধ্যে রেখে দেন। ভাগ্যক্রমে ফেয়ারোর এক সুন্দরী কন্যাস্নান করতে গিয়ে সেই ফুটফুটে ছেলেটিকে কুড়িয়ে নিয়ে আসেন রাজবাড়িতে। সেখানে সে রাজপুত্রের মতই মানুষ হতে থাকে। এই ভাবে মোজেজ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ভবিষ্যতে হিব্রুদের মুক্তিদাতা হতে পেরেছিলেন।

মোজেজ-এর পলায়ন ঃ বাইবেলে আছে যে একদা মোজেজ এক মিশরীয়কে হত্যা করে মিশর থেকে পালিয়ে যান। অবশেষে মুশা ক্যানানে যাবেন বলে হিব্রুদের নিয়ে সদলবলে পালিয়ে এলেন লোহিত সাগরের তীরে। পিছনে আসছিল ফেয়ারোর সৈন্যদল তাঁদের ধরবে বলে। প্রাণের ভয়ে হিব্রুরা লোহিত সাগরে নেমে পড়লেন। ভগবান তাঁদের জন্য লোহিত সাগরের ভিতর দিয়ে পথ করে দিলেন। কিন্তু যেই মিশরের সৈন্যরা তাঁদের পেছনে সমুদ্রে নামল অমনি পাহাড়ের মত ঢেউ এসে মিশরীয় সেনাদের ডুবিয়ে দিল। তারপরে তাঁরা এলেন সিনাই পাহাড়ের কাছে। সেখানে আসতেই মুশা নূতন দশটি দৈববাণী লাভ করলেন। আর তাঁর নিজের বিধান জানিয়ে দিলেন সবাইকে।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রাচীন গ্রীসের সভ্যতা

প্রথম পাঠ

ক্রীটের সভ্যতার প্রভাব

মেসোপটেমিয়া, মিশর ও ভারতে যখন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, তখন ভূমধ্য সাগরের উত্তর পূর্ব কোণায় ঈজীয় সমুদ্রের বুকে ক্রীট দ্বীপেও সেই সভ্যতার আলো ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছিল। ক্রীটের উন্নত সভ্যতার আলো পেয়েই গ্রীস সভ্যতার পথে পা দিতে শিখেছিল। তাই, গ্রীসের কাহিনী বলার আগে

ক্রীটের কথা একটু বলা দরকার। ক্রীটের সভ্যতা প্রায় ১৫০০ বছর পর্যন্ত টিকে ছিল। এ সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটেছিল ২০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। তারপর একদিন গ্রীকরা সে সভ্যতা ধ্বংস করে।

গ্রীকরা ছিলেন ভারতের আর্য-ভাষাভাষীদেরই একটা শাখা। তাঁরা ক্রীটের নগরগুলি ধ্বংস করলে কি হবে, ক্রীটের কাছ থেকে অনেক কিছু শিক্ষাও করলেন। ক্রীটে এসে তাঁরা নৌবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। ক্রীটের কাছ থেকে ঘরবাড়ি তৈরী ও দেওয়ালে ছবি আঁকা এবং ভাস্কর্য শিল্প শিখে তাঁরা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান
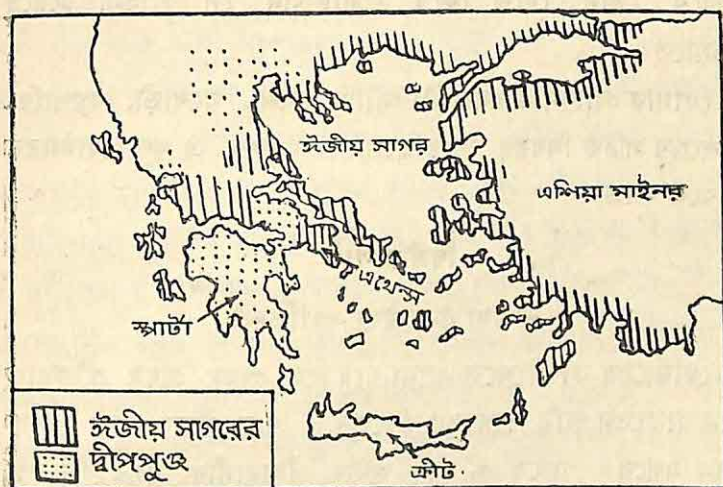
অধিকার করেছিলেন। ক্রীট ও ফিনিসিয়ার বর্ণমালা এবং লেখার পদ্ধতিও গ্রীকরা শিখেছিলেন। এক কথায় ক্রীটের সভ্যতার মধ্য দিয়ে ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার সমস্ত কিছুই গ্রীসে এসেছিল।

হোমারের যুগের গ্রীস

প্রাচীন গ্রীসের কাহিনী আমরা সে-যুগের অন্ধ কবি হোমারের লেখা **ইলিয়াড** এবং **ওডেসী** নামে দুটি মহাকাব্য থেকে জানতে পেরেছি।

ইলিয়াডের কাহিনী : ইলিয়াড মহাকাব্য আমাদের রামায়ণের সীতা হরণের মত এক কাহিনী নিয়ে রচিত। ট্রয়ের রাজা **প্যারিস**

একদা গ্রীক রাজা **মেনেলিউসের** অতিথি হয়েছিলেন। সেখানে মহারাণী **হেলেন**-এর রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁকে হরণ করে দেশে নিয়ে যান। সে অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য সারা গ্রীসের রাজারা মিলিতভাবে ট্রয় আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে এক বিরাট কাঠের ঘোড়ার পেটে গ্রীক সৈন্যরা লুকিয়ে ট্রয় জয় করেছিলেন।

ওডেসীর কাহিনী: ট্রয়ের যুদ্ধে গ্রীকদের পক্ষে যোগ দেন **ইথাকা**-র রাজা **ওডেসীয়ুস**। ট্রয় ধ্বংস করে তিনি দেশে ফিরবার পথে ঝড়ের মধ্যে দিক ভুল করেন। অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করে কিভাবে তিনি দেশে ফিরে এসেছিলেন সে কাহিনী রয়েছে ওডেসীতে।

হোমার প্রাচীন গ্রীসের রীতিনীতি, পেশা, ঘরবাড়ী, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্রের সঠিক বিবরণ দিয়েছিলেন। সেজন্য এ যুগ হোমারের যুগ বলে খ্যাত।

দ্বিতীয় পাঠ

নগর রাষ্ট্রের কাহিনী

হোমারের কাব্য থেকে জানা যায় যে প্রথম প্রথম গ্রীকরাও গ্রামে থাকতেন আর পশুচারণ করতেন। পরে তাঁরা গ্রাম থেকে এলেন নগরে। ক্রমে গ্রীকরা অর্থাৎ গ্রীসবাসীরা নগরগুলিতেই গড়ে তুললেন ছোট ছোট রাষ্ট্র। যিনি হতেন প্রধান সেনাপতি, পুরোহিত ও বিচারক তিনিই ছিলেন রাজার মত। কালক্রমে নগররাষ্ট্রের রাজাদের ক্ষমতা অনেক কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। পরে বহু নগররাষ্ট্রে সাধারণ মানুষদের নিয়েই শাসন চালানো হত। সাধারণ মানুষ অর্থাৎ জনগণের শাসনতন্ত্র বলে সে শাসন ব্যবস্থার গ্রীকরা নাম দিয়েছেন গ্রীসের **গণতন্ত্র**। সবচেয়ে বিখ্যাত গণতন্ত্র ছিল **এথেন্সে**। **স্পার্টা** ছিল অন্য এক বিখ্যাত রাষ্ট্র।

সাংস্কৃতিক বিনিময়: প্রাচীন গ্রীসের নগররাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে যেমন যুদ্ধ বিগ্রহ হত তেমনি তাদের মধ্যে ভাব ও চিন্তা এবং

অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিনিময় হত। শুধু নগর রাষ্ট্র নয়। ভূমধ্যসাগরের তীরের যে সমস্ত অঞ্চলে গ্রীকরা বাস করতেন সেখানের সঙ্গেও চলত সাংস্কৃতিক বিনিময়। খেলাধূলা, নাটক অভিনয় ইত্যাদিরও প্রতিযোগিতা হত। এই প্রতিযোগিতারই একটি উদাহরণ হচ্ছে অলিম্পিক-এর খেলাধূলা।

উপনিবেশ গঠন

গ্রীস ঈজীয় সাগরের দ্বীপ বলে গ্রীকগণ সমুদ্রপথে যাতায়াতে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। ভূমধ্যসাগরের সমস্ত বন্দরেই গ্রীসের জাহাজ চলাচল করত।

তার ফলে ভূমধ্যসাগরের উভয় তীরে গ্রীক ব্যবসায়ীদের অনেকগুলি উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। লাটিন ভাষাভাষী গ্রীকদের একটি শাখা এর মধ্যে ইতালীতে টাইবার নদীর প্রান্তে বসবাস করতেন। টাইবার নদীর অপর পাড়ে ছিল গ্রীকবাসীদের আর একটি শাখা ইউট্রাসক্যানদের বসতি। এঁরা কৃষ্ণ সাগরের তীরেও উপনিবেশ গড়েছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে স্পেন থেকে ককেশাস পর্যন্ত অসংখ্য গ্রীক উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। এখানে গ্রীক মাতৃভূমির সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার হয়। এগুলি মূল গ্রীক রাষ্ট্রের অধীন ছিল না। উপনিবেশগুলিতেও দাসশ্রমের ভিত্তিতে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

তৃতীয় পাঠ
এথেন্স ও স্পার্টার সমাজ জীবন

আগের অধ্যায়ে পড়া হয়েছে গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলোর কথা। এদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল **এথেন্স, স্পার্টা, করিন্থ ও থীবস**। এসব নগর রাষ্ট্রে ছিল বিভিন্ন ধরনের শাসন। এথেন্সে ছিল গণতন্ত্র, স্পার্টায় রাজার শাসন আর অন্যগুলিতে ছিল এদের দুয়ের মাঝামাঝি কোন শাসন ব্যবস্থা। এবার বলবো সবচেয়ে বড় দুটি নগর রাষ্ট্র এথেন্স ও স্পার্টার জীবন যাত্রার গল্প।

এথেন্সের সামাজিক জীবন ঃ তোমাদের মত বয়সের ছেলেদের এথেন্সে পণ্ডিত মহাশয়-দের টোলে পড়তে যেতে হত। এক একজন পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে কয়েকজন করে ছাত্র পড়ত। সেখানে পড়তে হত ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত। আর পড়বার বিষয় ছিল—ইতিহাস, গানবাজনা, শরীর চর্চা, আর শেষের দিকে আঁকা ও চিত্র শিল্প। মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হত বাড়িতে। ঘরে ঘরে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির কাজ, সুতাকাটা, তাঁত বোনা, নক্সা শেখার কাজ ও গান বাজনাও মেয়েদের শিখতে হত।

গ্রীকদের বেশভূষা

ষোল বছর বয়স হলেই ছাত্রদের শরীর চর্চার উপর বেশি নজর দেওয়া হত। আঠারো বছর বয়স হলে তাদের শেখানো হত নাগরিক জীবনের নানা কর্তব্যের কথা। যুদ্ধ বিদ্যা এবং পড়াশুনা শেষ হলে প্রত্যেককে নগররক্ষী বাহিনীতে যোগ দিয়ে রাষ্ট্রের সীমানার দুর্গগুলিতে থাকতে হত। তেইশ বছর বয়সে সে হত পূর্ণ নাগরিক। এথেন্সের নাগরিক হতে পারা সে যুগে ছিল মহা সম্মানের কথা। গ্রীকদের বাড়ি ঘর ছিল সাধারণ। মেয়েরাই ঘর গৃহস্থালীর কাজ করতেন। পুরুষদের কাজ ছিল বাইরে বাইরে। এথেন্সের মাঝখানে এ্যাগোরা বলে সুন্দর জায়গায় সকালে বাজার বসত। এর অন্যদিকে দিনের শেষে সকলে এসে গল্পগুজব করতেন। তাছাড়া নানা জায়গায় পণ্ডিতদের আলোচনা সভা হত আর বছরে কয়েকবার থিয়েটারে দর্শকদের ভীড় জমত।

বাড়ি ঘরের ও নগরের যত খাটুনির কাজ তা ছিল দাসদের জন্য। নাগরিকরা বলতে গেলে গায়ে ফুঁ দিয়েই বেড়াতেন।

স্পার্টার জীবন: স্পার্টার জীবন ছিল অত্যন্ত কঠোর আইন শৃঙ্খলার। মাত্র সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের বাপ-মায়ের সঙ্গে বাড়িতে থাকতে দেওয়া হত। তারপর থেকে সে ছেলের সব দায়িত্ব গ্রহণ করতেন সরকার। পড়াশুনা খাওয়া-দাওয়া সব কিছুর ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হত। স্পার্টার জীবনে এতটুকু বিলাসিতা করতে দেওয়া হত না। বারো বছর বয়স হলে সকলকে একবস্ত্রে থাকতে হত। বনজঙ্গলের নল খাগড়া কুড়িয়ে তারই বিছানায় শুতে হত। লেখাপড়ার চেয়ে জোর দেওয়া হত লাফ ঝাঁপ, কুস্তি, দৌড়, বর্শা, তলোয়ার খেলা এইসবের উপর। মেয়েদের একটু কম কঠোর ভাবে শিক্ষা দেওয়া হত অন্য বিদ্যালয়ে। ২০ থেকে ৩০ বছরের সবাইকে জাতীয় রক্ষী দলে নাম লেখাতে হত। ৩০ বছর পার হলে সে পেত বড়দের অধিকার। এর ফলে স্পার্টার সামরিক বিষয়ে খ্যাতি হয়। সাংস্কৃতিক দিকের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল এথেন্সের।

চতুর্থ পাঠ

এথেন্স ও স্পার্টার রাজনৈতিক জীবন

এথেন্সের রাজনৈতিক জীবন: এথেন্সের জীবনে দুটো রাজনৈতিক ব্যাপার ছিল। একটা ছিল অভিজাতদের সঙ্ঘ আর অন্যটি জনসাধারণের পরিষদ। এথেন্সের নাগরিকরা সকলে মিলে এক জায়গায় বিকেলে একত্রিত হতেন। সেখানে বসত পরিষদের অধিবেশন। এখান থেকেই রাজ্যশাসনের কাজে সবাইকে মতামত দিতে হত। দাসদের কোন অধিকার ছিল না।

স্পার্টার রাজনৈতিক জীবন: স্পার্টার সমাজ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণীতে ছিল নাগরিক বা **স্পার্টিয়াটি**; দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল **পেরিওকী**। এঁরা শহরের বাইরে বাস করেন।

তাঁদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য, কারিগরী ও অন্য পরিশ্রমের কাজ করতেন। নাগরিকেরা এসব কোন কাজ করতে পারতেন না। তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল **হিলট** অর্থাৎ ভূমিদাস বা দাস। জমিজমা চাষবাস কি প্রভুদের সেবাই ছিল তাঁদের কাজ। তাঁদেরও কোনও অধিকার ছিল না।

স্পার্টায় একটা মজার ব্যাপার ছিল। সেখানে দুজন রাজা থাকতেন। একজন অন্যের কাজের ওপর নজর রাখতেন। পাঁচজন **ইফর** বা পরিদর্শকের একটি কমিটির পরামর্শে রাজা শাসন করতেন। আইন কানুন রচিত হত বয়স্ক নাগরিকের সভায়। স্পার্টার শাসন-তন্ত্র **লাইকারগাস** রচনা করেছিলেন।

এথেন্স বনাম স্পার্টা : এথেন্সের চমকপ্রদ জীবন যাত্রা দেখে স্পার্টার ঈর্ষা জাগে। পারসীকদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এথেন্সের নেতৃত্বে গ্রীক রাজ্যগুলির একটি শক্তি জোট গড়ে উঠেছিল। যুদ্ধ শেষের পরে এথেন্স এই সব রাজ্যের উপর প্রভুত্ব আরম্ভ করে। এথেন্সের শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে স্পার্টা ৪৩১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এথেন্স আক্রমণ করে। স্পার্টার অঞ্চলটির নাম ছিল পিলোপনীজ। তাই এথেন্স ও স্পার্টার এ যুদ্ধ পিলোপনীজ যুদ্ধ নামে খ্যাত। খ্রীষ্ট পূর্ব ৪৩১ থেকে ৪৯৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলেছিল। যুদ্ধে এথেন্সের পরাজয় ঘটে ও স্পার্টা প্রাধান্য লাভ করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সংস্কৃতিজগতে এথেন্সের শ্রেষ্ঠত্ব

যুদ্ধে এথেন্স স্পার্টার কাছে পরাজিত হলেও সংস্কৃতি জগতে এথেন্স ছিল অপরাজেয়। আজও গ্রীসের সভ্যতা সংস্কৃতির কথা উঠলে এথেন্সেরই কথা বলতে হয়।

ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও শিল্পকলা : সম্রাট জারেক্সেস গ্রীস অভিযানে এসে এথেন্স নগরটিকে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে দিয়েছিলেন। সেই

ভস্মস্তূপের ওপর পেরিক্লিজের যুগে গড়ে উঠল এক নূতন এথেন্স। গ্রীক বিদ্যার দেবী এ্যাথিনা দেবীর মন্দির **পার্থেনন** হল গ্রীক স্থাপত্য আর ভাস্কর্যের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। সে মন্দিরের এ্যাথিনা দেবী মূর্তির ভাস্কর্য, আর অসংখ্য ছোটবড় সুন্দর সুন্দর দালান কোঠা, মন্দিরে মন্দিরে এথেন্স হয়ে উঠল এক রূপময়ী নগরী।

এই অপরূপ নগরের পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা যিনি করেন তাঁর নাম **ফিডিয়াস**। তিনি ছিলেন পেরিক্লিজের বন্ধু। ফিডিয়াস ছাড়া ছিলেন ভাস্কর **প্রাক্সিটেলিজ**। তিনি মানুষের মনোহর মূর্তি গড়ে তাতে সুখদুঃখের নানা ভাবের প্রকাশ করতে পারতেন। তাঁর একটি মূর্তির মূল্য হিসাবে কোন রাজা একটি শহরের সমস্ত সরকারী ঋণ শোধ করে দিতে চেয়েছিলেন। এথেন্সের ভাস্কর্য ভারতীয় শিল্পীদেরও প্রভাবিত করেছিল। এখানের কারু শিল্পীদের হাতে গড়া পান পাত্র ও ফুলদানী ছিল অপূর্ব।
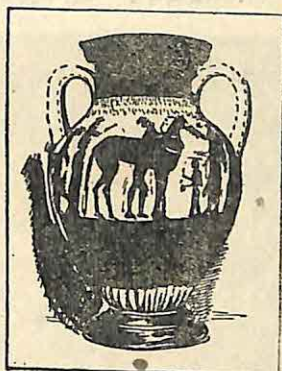
গ্রীসের অপূর্ব ফুলদানী

সাহিত্যের স্বর্ণযুগ : গ্রীক সাহিত্যেরও স্বর্ণযুগ এটা। তাঁদের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল কাব্য, নাটক, দর্শন ও ইতিহাসে। গীতিকাব্যে বিখ্যাত ছিলেন **পিণ্ডার** ও মহিলা কবি **স্যাফো**। পৃথিবীতে গ্রীকরাই প্রথম নাটক অভিনয়ের গৌরব অর্জন করেছেন। গ্রীসে নাটক ছিল ধর্মেরই অঙ্গ। নাট্যকার **এস্কাইলাস** প্রথম সত্যিকার নাটক অভিনয় আরম্ভ করলেন। এথেন্সের এ্যাক্রোপলিশের বিশাল মুক্ত অঙ্গন থিয়েটারে তাঁর নাটক অভিনীত হত। তার পরের বিখ্যাত নাট্যকার হলেন **সফোক্লিস**। এই যুগের সব নাটকই ছিল লোক-শিক্ষার বাহন। নগরের সমস্ত নাগরিকরাই যেতেন নাটক দেখতে। নাট্যকারেরা প্রধানতঃ দুঃখের কথাই বলতেন এসব নাটকে। করুণ রসের নাটকের তৃতীয় নাট্যকার হলেন **ইউরিপিডিস**। তিনি নাটকে

টেনে আনলেন মানুষের মনের কথা। গ্রীকরাই পৃথিবীতে প্রথম সত্যকার ইতিহাস লেখা শেখান। আর সে ইতিহাস রচনার জনক ছিলেন **হিরোডোটাস**। **থুসিডিডিস** ছিলেন অন্য এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক তিনি এথেনস্ ও স্পার্টার যুদ্ধের ইতিহাস লিখেছেন। এ যুগ ছিল বাগ্মিতার জন্যেও বিখ্যাত। শ্রেষ্ঠ বক্তা ছিলেন পেরিক্লিজ।

গ্রীসের ধর্ম ঃ গ্রীকদের বিশ্বাস ছিল অলিম্পিকের চূড়ায় আছে স্বর্গ। দেবতারা সব সেখানে থাকেন। আমাদের দেশের আর্যদের মত গ্রীসের লোকেরাও প্রকৃতির শক্তিকে দেবতারূপে উপাসনা করতেন। দেবতাদের রাজা ছিলেন **জীয়ুস**। তাঁর হাতে থাকত বজ্র; আমাদের দেশের ইন্দ্রের মত। তাঁর ভ্রূথেকে জন্ম নিয়েছেন এ্যাথিনা দেবী। তিনি গ্রীকদের রক্ষাকর্ত্রী ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। **এ্যাপোলো** ছিলেন পরম সুন্দর আকৃতির সূর্যদেব। সোনার রথে চড়ে তিনি পৃথিবীতে আলো দিয়ে বেড়ান।

এ্যাথিনা দেবী

ষষ্ঠ পাঠ

গ্রীসের বিখ্যাত মনীষীদের পরিচয়

এথেন্সের গৌরবময় যুগের মহান নেতার নাম **পেরিক্লিজ**। পেরিক্লিজের জন্ম হয় ৪৯০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। যখন সালামিসের নৌযুদ্ধ হয় তখন তাঁর বয়স ১১ বছর মাত্র। যৌবনেই তিনি এথেন্সের জীবনের সর্বক্ষেত্রে উদ্যোগী অংশ গ্রহণ করতেন। অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করে এই ভাবে নিজে সর্বক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করায় ৩৫ বছর তিনি এথেন্সের প্রধান শাসকের পদ লাভ করেন। তিনি বেশ রূপবান ছিলেন। তবে তাঁর মাথার মাঝখানটা একটু উঁচু ছিল। সেজন্য তিনি সর্বদাই মাথায় শিরস্ত্রাণ পরে থাকতেন। মাতৃভূমি এথেন্সের চেয়ে প্রিয় কিছু ছিল না তাঁর কাছে। তিরিশ বছর ধরে তিনি এথেন্সের শাসন পরিচালনা করেছিলেন। তবে তিনি স্বৈরতন্ত্রী ছিলেন না। অত্যন্ত ধৈর্য ধরে জনসাধারণকে বুঝিয়ে সব কাজ করাতেন।

পেরিক্লিজ

তাঁরই অনুরোধে ফিডিয়াস পারসীকদের অভিযানে ধ্বংস হওয়া এথেন্সকে পুনর্নিমাণ করেন। পেরিক্লিজ যে শুধু এথেন্সের মর্মর রূপ দান করেছিলেন তা নয়। তাঁরই আমলে, তাঁরই পরোক্ষ উৎসাহে তাঁর যুগে গ্রীকরা সাহিত্য, শিল্প, নাটক, বক্তৃতা, দর্শন, ভাস্কর্য, স্থাপত্য সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন।

স্পার্টার সঙ্গে যুদ্ধের সময় এথেন্সে প্লেগ মহামারী রূপে দেখা দেয়। পেরিক্লিজের পুত্র ও বোনের সেই রোগে মৃত্যু হয়। ৪২৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তিনি নিজেও রোগগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

নাট্যকার সোফোক্লিজ

শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনে যে বিরাট অগ্রগতি পেরিক্লিজের যুগে দেখা দিয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে সে অগ্রগতি সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে যায় নি। সোফোক্লিজ, সক্রেটিস, হিরোডোটাস প্রমুখ মহামনীষীরা সে সভ্যতা ও সংস্কৃতি আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

গ্রীসের নাট্যশাস্ত্রের আরম্ভ হয়েছিল **এসকাইলাসকে** দিয়ে। পৃথিবীর মধ্যে তিনিই প্রথম দর্শকদের আনন্দ দেবার জন্য নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। তাঁর পরের নাট্যকার হলেন সোফোক্লিজ। তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু ছিল করুণ। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল নাটকের চরিত্র-গুলির মনের কথা বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে। সেই নাটকের ভাষা, চরিত্রগুলির মহত্ব তাঁর নাটককে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে।

সোফোক্লিজ

সোফোক্লিজের জন্ম হয়েছিল এথেন্সের কাছে **কোলোনাস** নামে একটি স্থানে। একজন দক্ষ ধাতুর কর্মকারের সন্তান ছিলেন তিনি। তিনি এথেন্সের বিদ্যাপীঠে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করেছিলেন। ৪৬৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তিনি এসকাইলাসকে ডিঙিয়ে নাটকের প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। সর্ব শুদ্ধ তিনি ১৩০টি নাটক লিখেছিলেন। তবে তার মধ্যে মাত্র সাতটির সন্ধান পাওয়া গেছে।

সপ্তম পাঠ

দার্শনিক সক্রেটিস

এথেন্সের পথে পথে একজন বেঁটে ফর্সা কদাকার লোককে দেখা যেত। হঠাৎ কোনও ভাল সাজগোজ করা লোকের দেখা পেলে তিনি তাঁকে থামিয়ে হয়ত নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। প্রথমে

হয়ত এই ভদ্রলোক সামান্য পোশাকপরা লোকটিকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে যেতে চাইতেন। কিন্তু দু-একটা প্রশ্নের পর তিনি লজ্জিত হতেন। ততক্ষণে হয়ত তাঁদের চারদিকে লোকের ভীড় জমে যেত। প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে তিনি শেষ পর্যন্ত সত্য উত্তরে এসে পৌঁছতেন। ইনিই দার্শনিক শ্রেষ্ঠ সক্রেটিস।

এথেন্সের তরুণদের উপর তাঁর ছিল অসীম প্রভাব। এমনিভাবে তরুণ ছাত্রদের মনে তিনি প্রশ্ন জাগিয়ে তার উত্তর খুঁজতে বলতেন। সক্রেটিসের শিক্ষায় তাঁরা কোনও কুসংস্কারে বিশ্বাস করতেন না।

সক্রেটিস

এথেন্সের গোঁড়া পুরোহিতরা এজন্যে সক্রেটিসের উপর রেগে গিয়েছিলেন। এথেন্সের তরুণদের তিনি ধর্মের পথে না নিয়ে বিপথে চালাচ্ছিলেন বলে তাঁরা সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। বিচারে বিষ পান করে তাঁকে মৃত্যুবরণের আদেশ দেওয়া হয়। এবিষয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ ছাত্র প্লেটোর করুণ মর্মস্পর্শী বিবরণ লেখা আছে।

ইতিহাসের জনক হিরোডোটাস

পৃথিবীর মধ্যে সত্যিকার ইতিহাস লেখার আরম্ভ করেছিলেন এথেন্সের মহাপণ্ডিত **হিরোডোটাস**। ইতিহাস কিভাবে লিখতে হয় তা শিখিয়েছিলেন বলে তাঁকেই **ইতিহাসের জনক** বলা হয়। মিশরের কথা বলবার সময় বলেছি যে মিশরকে 'নীলনদের দান' বলে। কথাটি বলেছিলেন এই ঐতিহাসিক হিরোডোটাস। গ্রীকদের সঙ্গে পারসীকদের যে যুদ্ধ চলেছিল তার সবচেয়ে ভাল ইতিহাস লিখেছিলেন তিনি। এর আগে কেউ জানতেন না কি করে ইতিহাস লিখতে

হয়। এতদিন সত্যমিথ্যা রঙ্‌চঙা করা নানা কল্পনার উপকথাকেই লোকে ইতিহাস বলে মনে করত। সত্যমিথ্যায় মেশানো লেখা থেকে কি করে সত্যিকার ইতিহাসের জ্ঞান হয়—তা তাঁর লেখা পড়লেই জানা যায়। তাঁর রচনা যেমন সরল ও মধুর তেমনি হৃদয়গ্রাহী ছিল। অনেকে তাঁর রচনাকে নাটকের সঙ্গে তুলনা করেন।

হিরোডোটাস

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মাসিডনরাজ ফিলিপ ও আলেকজাণ্ডারের কৈশোর

(i) মাসিডন-এর রাজা ফিলিপ

পঞ্চাশ বছরের গৌরবময় ইতিহাসের পর স্পার্টা আর গ্রীসের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে এথেন্সের অবনতি ঘটে। গ্রীসের উত্তরে পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট একটি দেশ ছিল **মাসিডন** নামে। মাসিডনীরাও গ্রীক ছিলেন। তবে তাঁরা এথেন্সের মত অত সভ্য ছিলেন না। এদেশের এক রাজা ছিলেন ফিলিপ নামে। তিন বছর তিনি এথেন্সের প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র **থীব্‌সে** শিক্ষালাভ করেছিলেন। ৩৫৯ খ্রীঃ পূর্বাব্দে তিনি মাসিডনের সিংহাসন লাভ করে সে শিক্ষায় নিজের দেশকে শিক্ষিত করে তোলেন।

তাঁর প্রথম শিক্ষা ছিল এই যে, একদল ঐক্যবদ্ধ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক দিয়ে বিশ্বপৃথিবী অনায়াসে জয় করা সম্ভব। তাঁর দ্বিতীয় শিক্ষা ছিল এক কষ্টসহিষ্ণু দ্রুত গতিশীল সুশিক্ষিত ও আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদল গড়ে তোলা। আর তৃতীয় শিক্ষা ছিল দেশবাসীকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষাদান দেওয়া।

সে উদ্দেশ্যে তিনি নিজের পুত্র আলেকজাণ্ডারকে সুশিক্ষিত করার জন্য সক্রেটিসের শ্রেষ্ঠ শিষ্য প্লেটোর এক ছাত্র **এ্যারিষ্টটলকে** পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। এ্যারিষ্টটল চলন্ত বিশ্বকোষ বলে পরিচিত ছিলেন। ছেলের শিক্ষাব্যবস্থার পরে দুর্ধর্ষ সৈন্যদল নিয়ে তিনি দৃঢ় হস্তে সমগ্র গ্রীস দেশটিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন।

সারা গ্রীস জয় করা হয়ে গেলে কিশোর আলেকজাণ্ডার দুঃখ করে বলেছিলেন, বাবাই যদি সব জয় করে নিলেন তো আমার জন্য রইল কি! রাজা ফিলিপ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, "বাবা, তোমার জন্য রইল এই সসাগরা পৃথিবী। বড় হয়ে তুমি সারা পৃথিবী জয় করো।"

রাজা ফিলিপ তাঁর সমস্ত কল্পনা কার্যে পরিণত করার আগেই নিহত হয়েছিলেন। তাঁরা স্থান পূরণ করলেন পুত্র আলেকজাণ্ডার।

আলেকজাণ্ডারের কৈশোর

এ্যারিষ্টটলের কাছে শিক্ষা পেয়ে তরুণ আলেকজাণ্ডার মনেপ্রাণে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভক্ত হয়ে ওঠেন। তিনি স্বপ্ন দেখতে থাকেন সারা পৃথিবী জয় করে ছড়িয়ে দেবেন গ্রীক সভ্যতার আলো। গ্রীক রাজ্যগুলির সঙ্গে যুদ্ধে তিনি ১৮ বৎসর বয়সেই সেনাপতিত্ব করেন।

কৈশোরে আলেকজাণ্ডারের ভাল লাগত ইলিয়াডের ট্রয় যুদ্ধের কাহিনী পড়তে। সে যুদ্ধের সেনাপতি এ্যাকিলিস ছিলেন তাঁর আদর্শ। সারাক্ষণ তিনি তাঁর বীরত্বের স্বপ্নের ঘোরে মত্ত হয়ে থাকতেন। দিগ্বিজয়ে বেরোবার সময়েও তিনি এ্যাকিলিসের সমাধির উপর অর্ঘ্য দিয়ে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন।

নবম পাঠ

আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়

প্রথমে যখন পারস্যের রাজা গ্রীস আক্রমণ করেছিলেন তারপর প্রায় দেড়শো বছর কেটে গিয়েছে। এবার গ্রীক রাজা আলেকজাণ্ডার এশিয়া আক্রমণ করে তার প্রতিশোধ নিলেন।

বিশ্ববিজয়ে বেরোবার সময় আলেকজাণ্ডারের বয়স ছিল মাত্র কুড়ি বছর। দুর্ধর্ষ ও সুশিক্ষিত বাহিনী নিয়ে আলেকজাণ্ডার প্রথমে সমস্ত গ্রীস জয় করেন। তারপরে জয় করেন এশিয়া মাইনরের পারসীক রাজ্য গ্রীক উপনিবেশগুলি। তাঁরপর তিনি পাহার ডিঙ্গিয়ে সিরিয়া আক্রমণ করলেন। সেখানে পারস্য সম্রাট তৃতীয় দারিয়ুস স্বয়ং তাঁকে বাধা দিয়ে ব্যর্থ হন। সিরিয়ার পর তিনি প্যালেষ্টাইন জয় করে মিশরে অভিযান করেন। মিশর জয় করে আলেকজাণ্ডার সেখানে নিজ নামে আলেকজাণ্ড্রিয়া নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি সোজা নেমে এসে পারস্য জয় করেন।

আলেকজাণ্ডার

পারস্যের সম্রাট পরাজিত হলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের যে রাজ্যগুলি পারস্যের অধীন ছিল তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। আলেকজাণ্ডার বিজয়ী বাহিনী নিয়ে তাদের দমনের জন্য ভারতে আসেন। তবে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করতে আলেকজাণ্ডারকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু ভারতে প্রবেশ করার সময় তক্ষশীলার রাজা অম্ভী তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তাঁকে সবচেয়ে বড় বাধা পেতে হয়েছিল বিতস্তা নদীর পারের রাজা পুরুর কাছ থেকে। যুদ্ধে পুরু পরাজিত হয়েছিলেন ; তবে আলেকজাণ্ডার তাঁকে মুক্তি দিয়ে তাঁর সমস্ত রাজ্য ফিরিয়ে দেন।

পুরুর রাজ্যের পাশেই ছিল মগধের মহা শক্তিশালী নন্দসাম্রাজ্য। তাঁদের যুদ্ধক্ষমতা আর বিশাল বাহিনীর কথা শুনে গ্রীক সৈন্যগণ আর এগোতে অস্বীকার করে। তখন মগধজয়ের বাসনা মনে চেপে

রেখেই আলেকজাণ্ডারকে দেশের দিকে ফিরতে হল। একদল সৈন্য সমুদ্রপথে দেশে ফেরে। আর তিনি স্বয়ং বহু কষ্টে স্থলপথে প্রধান
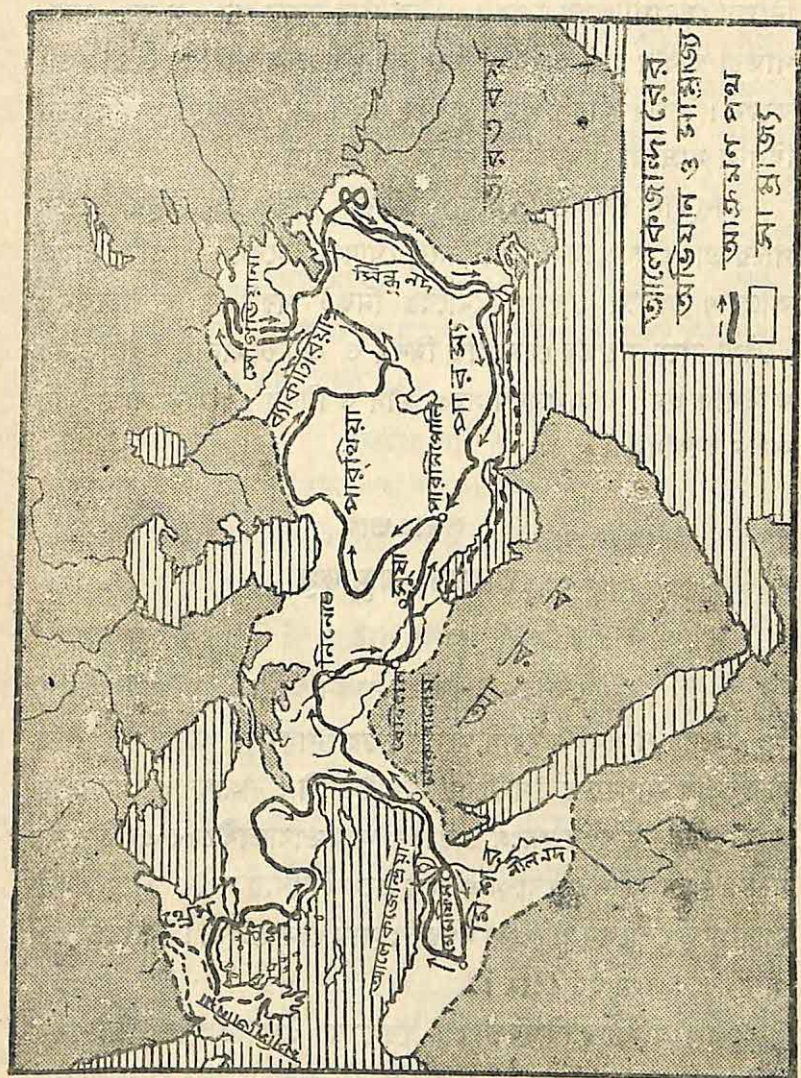
বাহিনী নিয়ে দেশের দিকে অগ্রসর হন। ৩২৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দে কয়েক দিনের জ্বরে ব্যাবিলনে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি আর দেশে (গ্রীসে) ফিরতে পারেন নাই।

সাম্রাজ্যের পতন ও রোমানদের গ্রীস জয়

দিগ্বিজয় করে আলেকজাণ্ডার সে-সব রাজ্য শাসনের ভার দেন নিজের সেনাপতিদের উপর। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সে-সব সেনা-পতিরা স্বাধীন হয়ে ওঠেন। তার সব পুত্র ও আত্মীয়দের এঁরা হত্যা করেন। তাঁর আর কোনও বংশধর রইল না। আলেকজাণ্ডারের বিশাল সাম্রাজ্য দেখতে না দেখতে লোপ পায়।

সেলুকাস নিজেকে মেসোপটেমিয়া, পারস্য ও সিন্ধুর পশ্চিম পারে ভারতীয় রাজ্যের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। তিনি ভারত আক্রমণ করলে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নিকট পরাজিত হয়েছিলেন। টলেমী নামে অন্যতম সেনাপতি মিশর ও এ্যান্টিগোনাস মাসিডনের অধিপতি হন। কালক্রমে সমগ্র গ্রীস ও মিশর রোমান সাম্রাজ্যের অধীন হয়েছিল।

তৃতীয় ভাগ

রোমের অভ্যুদয়

প্রথম পাঠ

রোমের আদিকাহিনী

গ্রীসের পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের উত্তর উপকূলের প্রায় মাঝামাঝি বুটজুতোর আকারের উপদ্বীপের নাম ইতালী। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ভারতের আর্য ভাষাভাষীদের একটি শাখা সরাসরি মধ্য এশিয়া থেকে এদেশে এসে টাইবার নদীর তীরে একটি নগর গড়ে তোলেন। এরা নগরটির নাম দেন **রোমা**। ইংরাজীতে সে নগরকে বলা হয় **রোম**।

রোম প্রতিষ্ঠার কিম্বদন্তী : রোমের এক রাজার ভাই-ঝির দু'টি যমজ পুত্র হয়েছিল। জন্মের পরেই রাজা তাদের জলে ডুবিয়ে মারার আদেশ দেন। জহ্লাদ তাদের না মেরে একটা ঝুড়িতে করে ভাসিয়ে দেন। সেই ঝুড়ি পাড়ে এসে ঠেকলে এক নেকড়ে-মা তাদের এনে নিজের দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখেন। তারপর এক

রাখাল তাদের মানুষ করেন। বড় হয়ে তাঁরা রোম নগরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রোমের উন্নতিঃ রোমের অপর পারে ছিল গ্রীসের অপর এক শাখা উপনিবেশ ইউট্রাস্কানদের বসতি। ইউট্রাস্কান রাজারা একদা রোম শাসন করতেন। তাঁরা ছিলেন খুব নিষ্ঠুর। তাঁদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে রোমানরা। ইউট্রাস্কান রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। ইতালীর অন্য সমস্ত রাজ্যের সঙ্গে প্রায়ই রোমের যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। দুশো বছর ধরে চলে সে যুদ্ধ। তারপর আলেকজাণ্ডার যখন ভারত অভিযানে ব্যস্ত তখন রোমানরা প্রায় সারা ইতালী জয় করেন।

দ্বিতীয় পাঠ

কার্থেজের সঙ্গে সংঘর্ষ

রোম যখন ক্রমাগত নিজের ক্ষমতা বাড়িয়ে চলেছিল সে-সময় আফ্রিকার উত্তর-উপকূলে পুরাকালের ফিনিসীয় ব্যবসায়ীদের **কার্থেজ** নামে এক বিশাল উপনিবেশ রোমের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। ইতালী উপদ্বীপের নীচের সিসিলি দ্বীপের ঠিক উল্টো দিকে উত্তর আফ্রিকায় ছিল কার্থেজ। সিসিলির প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে তখন কার্থেজের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। রোম থেকে সিসিলী খুব বেশী দূরের রাজ্য ছিল না। সেজন্য সিসিলি দখল করা নিয়ে রোম ও কার্থেজের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধ হয় তিনবার একশ বছর ধরে। রোমানরা কার্থেজকে পুনিসি বলতেন। সেজন্য সে যুদ্ধের নাম **প্যুনিক** যুদ্ধ।

প্রথম যুদ্ধ হয় খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৪ অব্দে—যখন সম্রাট অশোক আমাদের দেশে যুদ্ধ বর্জন করেছিলেন।

হামিলকার বার্কা ছিলেন সিসিলির কার্থেজ বাহিনীর নেতা। রোমানদের কাছে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল।

এমন সময় দ্বিতীয়বার রোমের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে। প্রাকৃতিক

বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে হস্তিবাহিনী নিয়ে স্পেন থেকে আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করে হানিবল রোম অবরোধ করেন। একটি যুদ্ধেও পরাজিত না হয়ে হানিবল ১০ বৎসর রোম অবরোধ করে রাখেন। এত করেও কিন্তু রোম জয় করতে তিনি পারেন নি। কার্থেজের অন্যান্য উপনিবেশ রোমানদের আক্রমণের মুখে পরাজিত হতে আরম্ভ করলে হানিবলকেও অবরোধ তুলে দেশে ফিরতে হয়েছিল। সে যুদ্ধে জীবনের প্রথম পরাজয় বরণ করলেন হানিবল। এর পরে তিনি আত্মহত্যা করে বন্দীত্বের আশঙ্কা দূর করেন।

রোমানরা তৃতীয় বার কার্থেজের বিরুদ্ধে অভিযান করলে যুদ্ধে কার্থেজ প্রবল বাধা দান সত্ত্বেও পরাজিত হয়েছিলেন।

কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়ে রোম এবার সভ্যজগতের সমস্ত পশ্চিমাংশ জুড়ে একচ্ছত্র আধিপত্য শুরু করল। পূর্বাংশে তাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মাসিডন। কালক্রমে সে মাসিডনও তাদের অধীনতা বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

তৃতীয় পাঠ
প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান

প্রথমে রোম ছিল ছোট্ট একটি নগর রাষ্ট্র—অনেকটা গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের মত। এই নগর রাষ্ট্রের সমাজ ছিল **প্যাট্রিসিয়ান** ও **প্লিবিয়ান** নামে দুই ভাগে বিভক্ত। প্যাট্রিসিয়ানরা ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর লোক। ধনী, দাসদের প্রভু, জমিদার, উচ্চপদের শাসক প্রভৃতিদের নিয়ে এই শ্রেণী গঠিত। এঁদের গর্ব ছিল যে এঁরা রোমের আদি পুরুষদের বংশধর। প্লিবিয়ানরা ছিলেন সাধারণ লোক। কৃষক, কারিগর, সৈন্য এঁদের নিয়েই প্লিবিয়ান শ্রেণী গঠিত। দেশ শাসনে এঁদের কোন অধিকার ছিল না। দেশের শাসনক্ষমতা ছিল দুজন অভিজাত শ্রেণীর লোকের হাতে। তাঁদের **কনসাল** বলা হত। এই কনসালরা সিনেট নামে নিজেদের পছন্দমত একটি শাসন পরিষদ মনোনীত করতেন।

প্লিবিয়ানদের কোনও রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। তাঁরা

নানা ভাবে অত্যাচারিত হতেন। অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে অনেকে দূরদেশে পালিয়ে যেতেন।

প্লিবিয়ানদের সকলেই সর্বহারা ছিলেন না। কেউ কেউ ছিলেন ধনী, ব্যবসায়ী ও জাহাজ মালিক। তাঁদের নেতৃত্বে নিজেদের অধিকার বৃদ্ধির জন্য প্রায় দুশো বছর ধরে প্লিবিয়ানরা প্যাট্রিসিয়ান-দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। এই ভাবে তাঁরা কনসাল এবং নিজেদের বক্তব্য রাখবার জন্য একজন ট্রিবিউন নির্বাচনের অধিকার লাভ করেন। ক্রমে ক্রমে দু'জনের মধ্যে একজন কনসাল নির্বাচনের ব্যবস্থা হয় প্লিবিয়ানদের মধ্য থেকে।

চতুর্থ পাঠ
রোমের নাগরিকত্ব

রোমের শাসনকর্তারা এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের অত্যন্ত সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। ইটালী অধিকাংশ বিজিত রাজ্যগুলিকে রোমের নাগরিকত্বের অধিকার দান করা হয়েছিল। অধিকাংশকেই দেওয়া হয়েছিল "মিত্র"-দের মর্যাদা। এঁরা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করেছিলেন ; আর লাভ করেছিলেন রোমের সমাজে বিবাহের অধিকার। তবে তাঁদের ভোটের অধিকার দান করা হয়নি। তাছাড়া ইটালীর সর্বত্রই রোমান নাগরিকদের অসংখ্য উপনিবেশ ছিল। সে সব উপনিবেশের নাগরিকরা পুরোপুরি নাগরিকত্বের অধিকার ভোগ করতেন। ঐ সব দেশের প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ দখল করে তা রোমান নাগরিকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

পঞ্চম পাঠ
দাসত্ব ও দাস বিদ্রোহ

গ্রীসের মত রোমও ছিল দাস-শ্রম নির্ভর রাষ্ট্র। আদিযুগে পরিবারের সদস্য হিসাবেই দাসদের দেখা হত। পরে যখন যুদ্ধবিগ্রহ বাড়তে লাগল, তখন দাসদের সংখ্যা যেমন বাড়ল, তেমনি অবস্থারও অবনতি ঘটল। নানা স্থানের দাস বাজারে লক্ষ লক্ষ দাস কেনা,

বেচা হত। দাসরাই প্রকৃত চাষবাস আর খাটাখাটুনি করতেন। যে-কোনও ধনীর ছিল শত শত দাস।

দাসদের জীবন ছিল খুবই কষ্টের। তাঁদের তুমুঠো খাবার দিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়ে উদয়াস্ত কাজ করানো হত। মালিকেরা নির্মম চাবুক মেরে সবাইকে কাজ করাতেন। বিভিন্ন উপনিবেশে খনির কাজে, কি অন্য কাজে দাসদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়।

গলার কলার

রাতে পায়ে বেড়ী দিয়ে দাসদের বন্দী করে রাখা হত। আর গলায় পরিয়ে দেওয়া হত কলার। পালিয়ে গিয়েও তাদের নিস্তার ছিল না। ধরা পড়লে পশুর মুখে ফেলে তাঁদের হত্যা করা হত। রোমের আমোদ প্রমোদের জায়গার নাম ছিল এ্যাম্পিথিয়েটার। সেখানে অবাধ্য দাসদের এমনি করে পশুর মুখে ফেলে অভিজাতরা মজা করতেন। এত নিষ্ঠুর ছিলেন তারা। যাঁরা পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করতেন তাঁদের বলা হত গ্লাডিয়েটার।
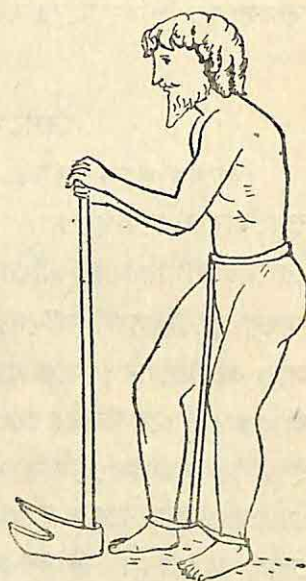
পায়ে বেড়ী দেওয়া দাস

দাস বিদ্রোহ : স্পার্টাকাস

অত্যাচার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলেই বিদ্রোহ ঘটে। তাই রোমেও অনেক বার দাস বিদ্রোহ ঘটেছিল। তবে সে সব বিদ্রোহের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাস বিদ্রোহ। বিদ্রোহটি ঘটেছিল খ্রীঃ পূঃ ৭৩ অব্দে।

স্পার্টাকাস ছিলেন বলকান উপদ্বীপের লোক। রোমানরা তাঁকে

বন্দী করে ক্রীতদাসে পরিণত করেন। অবাধ্যতা করার জন্যে তাঁকে গ্ল্যাডিয়েটার করা হয়। তাঁর মত আরও কয়েকজন গ্ল্যাডিয়েটার কাপুয়া জেল ভেঙ্গে ভিসুভিয়াস পর্বতের চূড়ায় জংলা আঙ্গুরের ঘন জঙ্গলের আড়ালে পালিয়ে যান। সে সংবাদ পেয়ে নানাদিক থেকে আরও অনেক দাস তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। পরে এঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৭০,০০০। এঁরা বীর স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন। রোমের শ্রেষ্ঠ সৈন্যদল নামিয়েও সহজে তাঁদের দমন করতে পারা যায় নি। প্রায় দেড় বছর চলেছিল সে বিদ্রোহ দমনে। অবশেষে দাসদের মধ্যে আত্মকলহে বিদ্রোহীরা দুর্বল হন। এমন সময় যুদ্ধে স্পার্টাকাসের মৃত্যু হলে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। প্রায় ৬০০০ বিদ্রোহীকে প্রধান রাজপথের দুপাশে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল।
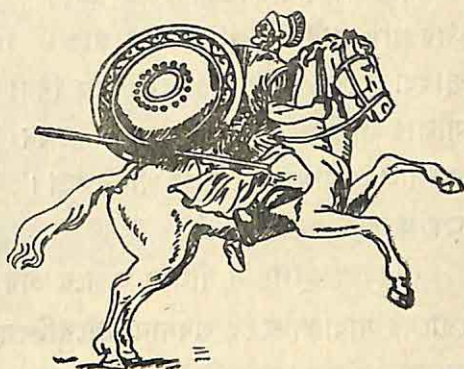
যুদ্ধে আহত স্পার্টাকাস

ষষ্ঠ পাঠ

রোমান সাধারণতন্ত্রের অবসান

একদিকে প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের মধ্যে সংঘর্ষ আর অন্যদিকে দাসদের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহে রোম সাধারণতন্ত্র ভেঙ্গে পড়ার মত হয়। অসংখ্য যুদ্ধফেরত সৈন্য টাকার লোভে যে কোন ধনীর অধীনে কাজ করতেন। যে ধনীর হাতে যত বেশী সৈন্য থাকত তিনি তত প্রাধান্য লাভ করতেন। সেজন্য এসময় থেকে নাগরিকদের ভোটের আর কোন দাম রইল না। সৈন্যদলের জোরে এক একজন নেতা তখন রোমান সাধারণতন্ত্রের নেতৃত্ব চালাতেন। ভয়ে নাগরিকরা সেনাপতিদের বিরুদ্ধতা করতে পারতেন না। বিভিন্ন সেনাপতির

মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্বে রোমের সাধারণতন্ত্র এসময়ে ভেঙ্গে পড়েছিল। সত্যকার সাধারণতন্ত্র বলতে আর কিছুই ছিল না।

সাধারণতন্ত্র থেকে রোমান সাম্রাজ্য

রোমান সাধারণতন্ত্রকে এই দুঃসময়ে প্রথম যিনি রক্ষা করেন তাঁর নাম **গেইয়াস জুলিয়াস সীজার**। প্লিবিয়ানদের বেশী সুযোগ সুবিধা দিয়ে এবং সাধারণ লোককে বিনা পয়সায় খাদ্য বিতরণ করে সীজার জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তখন তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন কনসাল এবং গল প্রদেশের শাসনকর্তা। গল থেকে তিনি ইংলণ্ডও জয় করেছিলেন।

প্রথমতঃ জুলিয়াস সীজার ও পরে তাঁর ভাইপো অগাষ্টাস সীজার রোমের সাধারণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছিলেন। তখন থেকে রোমে আরম্ভ হয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

সপ্তম পাঠ

জুলিয়াস সীজার

সীজার শুধুমাত্র দিগ্বিজয়ী ছিলেন না। তিনি ছিলেন অপূর্ব প্রতিভাধর শাসনকর্তা ও লেখক। তিনি বিজিত রাজ্যগুলি লুণ্ঠন ও ধ্বংস করতে চান নি। তিনি বিজিত প্রদেশগুলির সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সিনেটের সভ্যরা তাঁকে আজীবন **ডিক্টেটার** নির্বাচিত করেন। যিনি নিজের ইচ্ছামত দেশ শাসন করতে পারেন তাঁকে বলে ডিক্টেটার বা এক-নায়ক।

জুলিয়াস সীজার

প্রকৃতপক্ষে তখন সীজারই ছিলেন রোমের মুকুটবিহীন সম্রাট।

তবে এর চার বছর পরেই একদল দেশনেতা তাঁকে হত্যা করে-

ছিলেন। এরপর তাঁর ভাইপো অক্টাভিয়ান খুড়ো সীজারের শত্রুদের
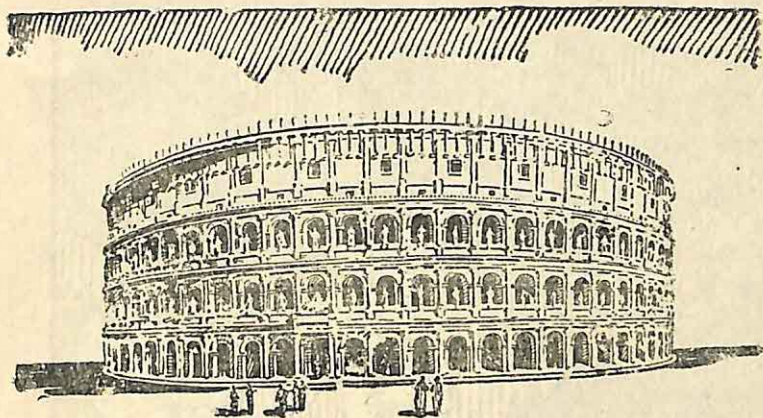
কলোসিয়াম

ধ্বংস করে নিজেকে সম্রাট অগাষ্টাস বলে ঘোষণা করেছিলেন।
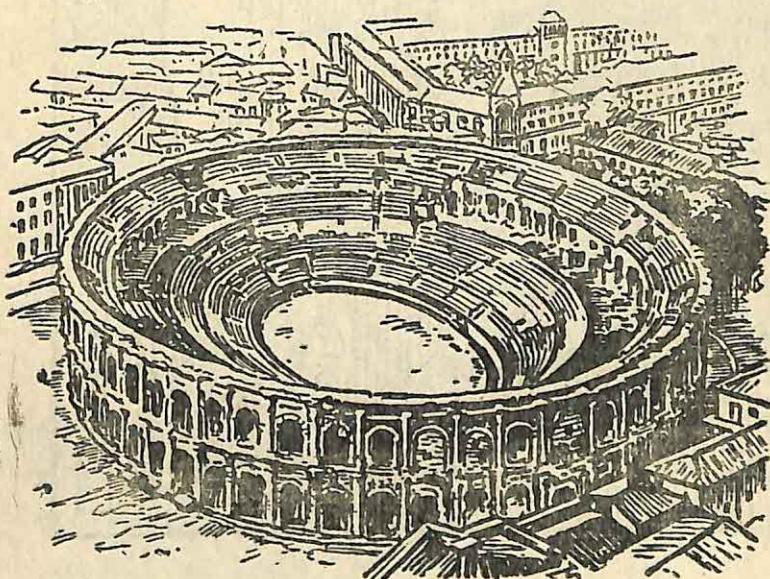
এ্যাম্পিথিয়েটার

জুলিয়াস সীজারের নাম থেকে আমরা ইংরাজী জুলাই মাস এবং অগাষ্ট নাম থেকে আগষ্ট মাস নামটি পেয়েছি।

জুলিয়াস সীজার ও তাঁর ভাইপো অগাষ্টাস সীজার নিজ বাহুবলে
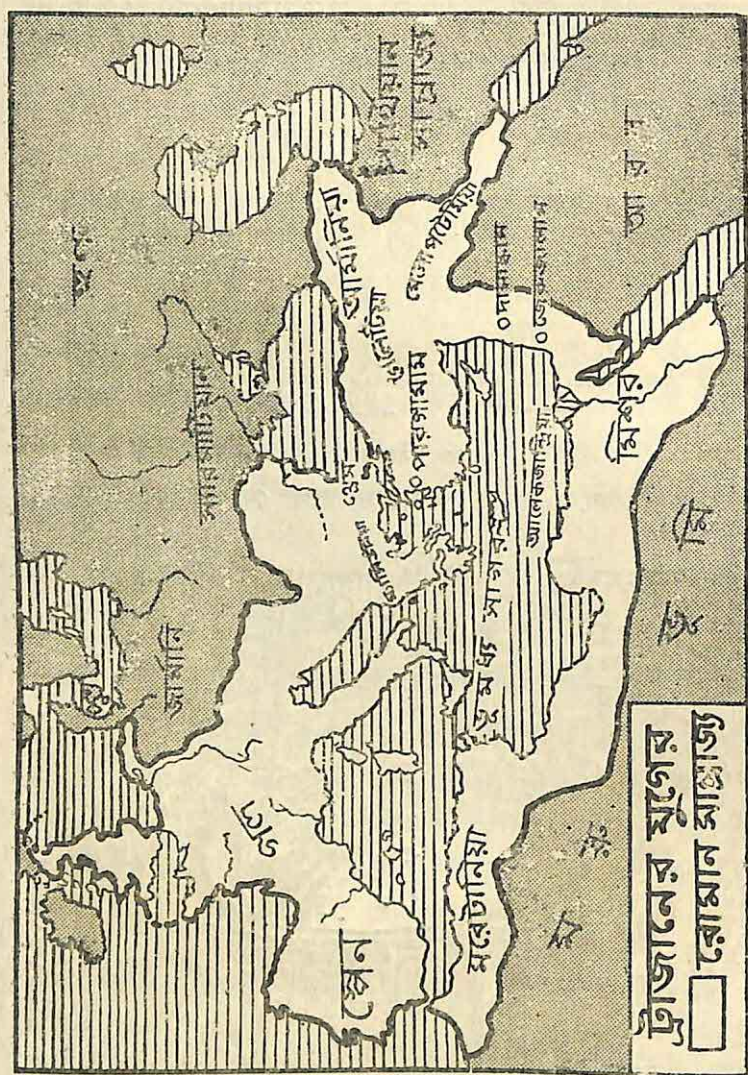
বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। প্রায় হুশো বছর একটানা শান্তি-শৃঙ্খলার মধ্যে এই সাম্রাজ্যের বিকাশ ঘটে।

অবনতি ও ধ্বংস

কালক্রমে রোমের সাম্রাজ্য নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনল। এতবড় সাম্রাজ্য শাসনের উপযুক্ত সম্রাট বেশী ছিলেন না। সাম্রাজ্যের উন্নতিতে ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তিতে সৈন্যদল অলস ও যুদ্ধবিমুখ হয়ে ওঠেন। তাছাড়া সমগ্র অভিজাত সমাজে বিলাসিতা ও অন্যান্য নানা দোষে সমাজজীবন কলুষিত হয়। এর উপরে ছিল দাসদের প্রতি অমানুষিক আচরণ ও শোষণ এবং তাঁদের বিদ্রোহ।

হুন জাতির আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য একদিন ভেঙ্গে পড়েছিল। রোমান সাম্রাজ্যের চরম বিকাশ ঘটেছিল সম্রাট ট্রাজানের সময়।

অষ্টম পাঠ
খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয়

জুলিয়াস সীজারের ভাইপো অগাষ্টাস যখন রোমের সম্রাট তখন রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব-প্রান্তের ছোট্ট জুডিয়া প্রদেশে খ্রীষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যীশু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল এক দরিদ্র ইহুদীর গৃহে।

বড় হয়ে তিনি ইহুদীদের ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করেন। সেই সঙ্গে নিজের সত্যধর্মের কথা বলতে থাকেন। তাঁর চরিত্রমাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে একটি-দুটি করে কয়েকজন তাঁর শিষ্য হন। শিষ্যদের নিয়ে তিনি গ্যালিলিতে ধর্মপ্রচার করতে যান। ক্রমে ক্রমে অসংখ্য জনতা তাঁর বাণী শোনার জন্য আকুল হয়ে ওঠেন। যীশু তখন এক পর্বতের উপর উঠে তাঁদের সকলকে দশটি বাণী শোনান। সেই দশটি বাণীই হচ্ছে খ্রীষ্টান ধর্মের মূলমন্ত্র।

সত্যবাদিতা, বিনয়, অনুতাপ প্রভৃতি গুণের চর্চা করে তিনি সকলকে পবিত্র জীবনযাপনের উপদেশ দেন। তাঁর ধর্মের প্রধান কথা হল পাপীতাপী সবার জন্যই পরলোকে **ভগবানের**

রাজত্ব। প্রেম ও ভালবাসা, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাব-ই স্বর্গের পথ। যীশু নিজেকে ইহুদীদের মুক্তিদাতা বলে ঘোষণা করলেন।

ভগবানের রাজত্বের কথা শুনে রোমান শাসকগণ "তাঁকে রাজদ্রোহী" বলে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেন। খ্রীষ্টানদের উপর প্রথম ৩০০ বছর ধরে অকথ্য অত্যাচার চলেছিল। সেজন্য সকলে গোপনে খ্রীষ্টধর্মের আলোচনা করতেন। যীশুর মৃত্যুর ৩৩৭ বছর পর রোমান সম্রাট কনষ্ট্যাণ্টাইন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর সহায়তায় ধীরে ধীরে খ্রীষ্টধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। খ্রীষ্টধর্ম আর তখন গরীবদের ধর্ম মাত্র ছিল না। ধনীরাও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

চতুর্থ ভাগ

মহান চীনের প্রাচীন কাহিনী

প্রথম পাঠ

মহান সাং

চীনে তাম্র-ব্রোঞ্জ সভ্যতার আলোচনার সময় বলা হয়েছিল যে এ যুগের সঙ্গে সাং বংশের নাম জড়িত। প্রকৃতপক্ষে সাং বংশের প্রতিষ্ঠাতা চ্যাং টানকে তাঁর প্রজাহিতৈষী ও মানব কল্যাণব্রতী কাজের জন্য মহান সাং বলে ডাকা হত। তাঁর নাম প্রজাদের মুখে মুখে এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে তিনি এক কিম্বদন্তীতেই পরিণত হয়েছিলেন।

তাঁরই উদ্যোগে চীনে ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতার পত্তন হয়েছিল। তিনিই কৃষকদের জলসেচ, বাঁধ বেঁধে ক্ষেত রক্ষা ইত্যাদি শেখান। তারপর উন্নত লাঙ্গলের প্রচলন করে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করেন। তাঁরই সাহায্যে কারিগরশ্রেণী চমৎকার নক্সাকাটা মৃৎপাত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সকলের উপরে ছিল তাঁর চরিত্রমাধুর্য ও প্রজাদের জন্য দরদ। তিনি প্রজাদের সর্বদা সৎপথে চলার উপদেশ দিতেন। আর তাঁদের ধর্মের কুসংস্কার বর্জন করতে বলতেন। প্রজাদের আশ্বাস দিতেন—যদি তাঁর পরামর্শ শুনে কারুর ক্ষতি হয় তাহলে তিনি

তার সব দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করিবেন। নিজের জীবন বলি দিতে চেয়ে তিনি সে কথা প্রমাণও করেছিলেন।

দেশে একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। সম্রাট নিজেকে সেজন্য দায়ী করে নির্জনে ভগবানের তপস্যায় বসলেন। তারপর তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য প্রাণ বলি দিতে উদ্যত হন। তখন ভগবান তাঁকে রক্ষা করেন। ভগবানের দয়ায় দেশের বুক থেকে দুর্ভিক্ষ দূর হয়। দেশ হয় আবার শস্যশ্যামলা।

কনফুসিয়াসের নীতিকথা

গৌতম বুদ্ধ যখন ভারতের নগরে নগরে মানুষের মুক্তির জন্য সৎ আচরণের বাণী শোনাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই হিমালয়ের ওপারে চীন দেশেও চৌরাজবংশের যুগে একজন মহাপুরুষ তাঁর বাণী প্রচার করছিলেন। চীনাভাষায় তাঁর নামের উচ্চারণ কুংফুৎসু। আমরা তাঁকে কনফুসিয়াস বলে জানি। চীনা ভাষায় নামটির অর্থ হচ্ছে দার্শনিক কুং।

বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গুণের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন ছাত্রদের নিয়ে তিনি পাঠশালা খোলেন। তিনি মুখে মুখে বলে যেতেন কবিতা, সদাচার আর ইতিহাসের গল্প। আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা, আচার ব্যবহার শেখাতেন খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তাঁর সমস্ত শিক্ষার মধ্যেই সঙ্গীতের এক উঁচু স্থান ছিল।

নিজের আদর্শ কাজে পরিণত করার সুযোগ পেলেন তিনি একান্ন বছর বয়সে। চীনের সম্রাট তাঁকে চুংটু জেলার শাসনকর্তা করে দেন। সেই রাজ্যে মানুষ কখন কি করবে, কি বেশভূষা পরবে, সমাজের কোন স্তরের লোক কি খাবে, এসমস্ত কিছুরই ছক তিনি বেঁধে দিয়েছিলেন।

পরে তিনি নিজের দেশে ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। বৃদ্ধ বয়সে দুজন প্রিয় শিষ্যের মৃত্যুতে তিনি গভীর শোক পেয়ে প্রাণ হারান।

কনফুসিয়াস লোককে ভগবান, মৃত্যু বা বৈরাগ্যের কথা শেখাতেন না। সংসারে থেকেই সমাজের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে

বলতেন। শেখাতেন মানুষ মাত্রেই কতকগুলো সৎগুণের চর্চা করলে সহজেই সমাজের উন্নতি হতে পারে। তাঁর শিক্ষার মূল কথা ছিল অতীতের আচার নিষ্ঠা পূর্বপুরুষ ও বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা

মহাজ্ঞানী কনফুসিয়াস

এবং পরিবারের ঐক্য বজায় রাখা। তাঁর আদর্শ ছিল সবচেয়ে ভাল নাগরিক আর সমাজসেবক হওয়া। সে আদর্শই বহু বহু যুগ ধরে মহাচীনের মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে।

দ্বিতীয় পাঠ

চীনের বিরাট প্রাচীর নির্মাণ

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মধ্য চীন থেকে হিউংনু, উম্বুন প্রভৃতি হিংস্র যাযাবর শ্রেণীর লোক প্রায়ই চীনের শস্যশ্যামল অঞ্চল আক্রমণ আর লুঠপাঠ করত। তাদের আক্রমণ থেকে দেশরক্ষা এক অসাধ্য কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ততদিনে চীনে ঐক্যবদ্ধ চীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সম্রাট শী ইয়াংতী মহাশক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি যাযাবরদের আক্রমণ ঠেকাবার জন্য এক বিরাট প্রাচীর নির্মাণের পরিকল্পনা করলেন। দেশের সব অঞ্চল থেকে
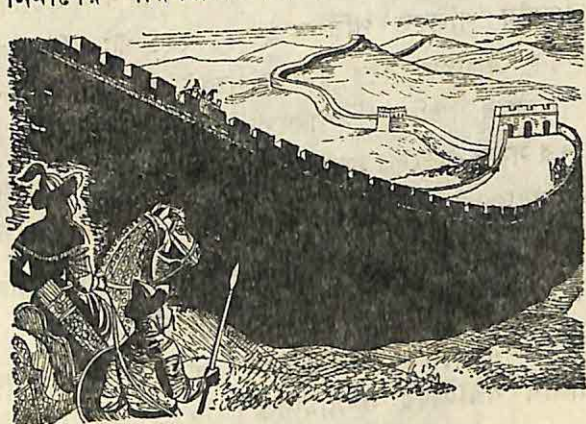
চীনের প্রাচীর

প্রায় ২০ লক্ষ লোককে জোর করে ধরে এনে তাদের দিয়ে পাহাড়-প্রমাণ পালিশ করা পাথর, ইট সুড়কী বইয়ে আনেন। চীনের উত্তরে চিহলি উপসাগর থেকে অন্তর্মঙ্গোলিয়ার জলাজমি পেরিয়ে উত্তর-পশ্চিমের মরুভূমির পাশ কাটিয়ে তিব্বতের প্রান্তে এসে সে প্রাচীর শেষ হল। ৪০০০ কি. মি. দীর্ঘ হল সে প্রাচীর। প্রাচীরের মাঝে মাঝেই গম্বুজ আছে পাহারা দেবার জন্য। আর ছিল লোক যাতায়াতের জন্য গেট। সে প্রাচীর এত চওড়া যে ৫।৬ জন ঘোড়সওয়ার পূর্ণগতিতে প্রাচীরের উপর দিয়ে ছুটতে পারেন। এ প্রাচীর পৃথিবীর সমস্ত আশ্চর্যের একটি। এর পাশ দিয়েই

গিয়েছে ভারত আর মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে সংযোগ রাখার রেশমপথ। এই প্রাচীরে ঘেরা রাজ্যই প্রকৃত চীন।

চীন সাম্রাজ্য

খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনে সাতটি রাজ্য পরস্পরের মধ্যে প্রাধান্য লাভের চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চীন, চু ও চী এই তিনটি রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। পরে প্রভু সাঙ নামে এক অপূর্ব প্রতিভাধর মন্ত্রীর সহযোগিতায় রাজা সিয়াও চীন রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় কৃষির উন্নতি ঘটে, দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং চীন রাজ্য সর্বপ্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। ২২১ খ্রীঃ পূর্বাব্দে হুয়াংতী সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে নিজে সম্রাট শী হুয়াংতী নাম গ্রহণ করেন। তারপর তিনি দক্ষিণাঞ্চলের আরও রাজ্য জয় করেন। সারা দেশের সমস্ত প্রভুদের তিনি দমন করেছিলেন। দেশের সর্বত্র রাস্তাঘাট নির্মাণ করে তিনি সৈন্য চলাচল ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটান। তিনি সমগ্র চীনে এক ওজন, মুদ্রা ও ধ্বনিলিপি প্রবর্তন করেন। বিরাট প্রাচীর তাঁরই অবিনশ্বর কীর্তি।

এর পরে উল্লেখযোগ্য হল হান রাজবংশের যুগ। এঁরা ছিলেন গুপ্ত ও রোমান সম্রাটদের সমসাময়িক। তখন উত্তর ভিয়েতনাম, কোরিয়া ও মধ্য এশিয়ার একাংশ হান সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

পঞ্চম ভাগ

ভারতের কাহিনী

প্রথম পাঠ

আর্যদের বিভিন্ন শাখা

বহু বহু যুগ আগে পৃথিবীর বুকে আর্য ভাষাভাষী লোক বাস করতেন। সম্ভবত মধ্য এশিয়া ও ইউরোপে, কিংবা পূর্ব-ইওরোপে ছিল এঁদের বাসভূমি। এই বাসভূমি থেকে কালক্রমে কেউ গিয়েছেন মিশরে, ইতালীতে আবার কেউ ছুটে এসেছেন পাহাড়

ঘেরা ইরাণে কিংবা ভারতের মত শস্য শ্যামল অঞ্চলে এসেছেন ঘোড়া ছুটিয়ে টগবগিয়ে।

ভারতের আর্য

আর্যদের যে শাখা ভারতে এসেছিলেন তাঁরা আসেন উত্তর-পূর্ব ইরাণ আর কাস্পিয়ান সাগরের চারিপাশের অঞ্চল থেকে। সে আজ থেকে প্রায় ৩৫০০ বছর আগের কথা। হরপ্পা সভ্যতা তখনো ধ্বংস হয়নি। ভারতে এসে তাঁরা সর্বপ্রথমে বসবাস করেন পাঞ্জাবে। এ অঞ্চলকে তাঁরা বলতেন সপ্তসিন্ধু। সিন্ধুনদের পাঁচটি শাখা, আর সরস্বতী, দৃষদ্বতী, এই সাতটা নদী দিয়ে ঘেরা ছিল এই অঞ্চল। তাই এর নাম হয় সপ্তসিন্ধু।

এঁরা ছিলেন রাখালিয়া যাযাবর জাতি। পশু পালন ও শিকার করাই ছিল এঁদের প্রধান কাজ। এঁদের মধ্যে লিখিত ভাষার প্রচলন ছিল না। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে এসে তাঁরা মুখে মুখে নানা কাব্য রচনা করেন। সে কবিতাগুলি নিয়েই রচিত হয়েছে চারটি বেদ। আর্যদের ইতিহাস আমরা জেনেছি তাঁদের মুখে মুখে রচিত সেই চারটি বেদ থেকে।

দ্বিতীয় পাঠ

চতুর্বেদ

ঋগ্বেদ—সেই চারটি বেদই ভারতের আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বসবাসের সময় তাঁরা সর্বপ্রথম ঋক্‌বেদ রচনা করেন। ঋগ্বেদ বলতে বোঝায় স্তব বা স্তোত্র মাত্র। ঋগ্বেদে প্রায় একহাজার আঠাশটি স্তব বা স্তোত্র আছে। মানুষের জীবনের সুখশান্তি এবং প্রকৃতির বিভিন্ন দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য এইসব স্তোত্র রচিত হয়েছিল। স্তোত্রগুলির ছন্দ ও ভাব অতি মধুর ও মহান।

এসব স্তোত্রের সঙ্গে সঙ্গে ঋগ্বেদে ইতিহাসেরও নানা ঘটনার উল্লেখ আছে। যেমন আর্য ও অনার্য রাজাদের বিরুদ্ধে দিবোদাস নামে এক রাজার যুদ্ধ; ভরত বংশের রাজা সুদাসের কাছে দশটি শত্রু গোষ্ঠীর মানুষের পরাজয়।

সামবেদ—যে পুরোহিতরা গান গেয়ে যাগযজ্ঞ করতেন। সোম-যজ্ঞের সময় তাঁরা যে স্তবস্তোত্র পাঠ করতেন তা নিয়ে রচিত হয়েছে **সামবেদ**। যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ ভাবে এইসব স্তোত্র ঋগ্বেদ থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে।

যজুর্বেদ—যজ্ঞের সময় যে সব গদ্যে আর পদ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হত তা নিয়ে যজুর্বেদ রচিত হয়েছে। যজুর্বেদের গদ্য সাহিত্যই হচ্ছে প্রাচীনতম সংস্কৃতের গদ্যরূপ।

অথর্ববেদ—তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্র, রোগের চিকিৎসা, অসুর দমন, ভূতপ্রেত এইসব দমনের জন্য মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে অথর্ববেদ রচিত হয়েছে। এই বেদে মধ্যবিত্ত আর্য মানুষের জীবনযাত্রা, ব্যবসায়ী ও কৃষক-দের এবং স্ত্রীলোকদের দৈনন্দিন জীবনের বিবরণ আছে। এই বেদকে ব্রহ্মবেদ বলা হয়। চার বেদ ছাড়া আরও অনেক রচনা ছিল বেদ নিয়ে। সেগুলিকে বলে **আরণ্যক ও উপনিষদ**।

তৃতীয় পাঠ
আর্যদের সমাজ

আর্যদের সমাজ নানা কুলে বিভক্ত ছিল। কুলগুলি আবার বিভক্ত ছিল গ্রামে বসবাসকারী কয়েকটি পরিবারে। সে পরিবার পিতৃতান্ত্রিক—অর্থাৎ পিতাই ছিলেন পরিবারের প্রধান। তাঁর আদেশ মেনে সকলকে চলতে হত। সমাজে মেয়েদের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল।

ভারতে এসে রাখালিয়া আর্য জাতি কৃষিকাজ শিখে গ্রামে স্থায়ী বসতি স্থাপন করলেন। সেই সঙ্গে শিখলেন নানা কারিগরীর কাজ। এর ফলে এক গ্রামের সঙ্গে আর এক গ্রামের পণ্য বিনিময় আরম্ভ হয়। প্রথমে আর্যদের সমাজ বিভক্ত ছিল তিনটি শ্রেণীতে—যোদ্ধাদের **ক্ষত্রিয়** শ্রেণী, পূজারীদের **ব্রাহ্মণ** শ্রেণী, কারিগর ও কৃষকদের **বৈশ্য** শ্রেণী। পরাজিত স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে পরে চতুর্থ **শূদ্র** শ্রেণী গঠিত হয়েছিল। কালক্রমে সমাজে ব্রাহ্মণদের মর্যাদা সবচেয়ে বেশী হয়।

আর্যরা লোহার ব্যবহার জানতেন বলে নানা জিনিস উৎপাদনে আর যুদ্ধে এগিয়ে গেলেন। কৃষি ছাড়া তাঁদের অন্য উপজীবিকার মধ্যে প্রধান ছিল ধাতুকর্ম, ছুতার মিস্ত্রীর কাজ, সূতাকাটা ও তাঁত বোনা। আর্যরা অলঙ্কার খুব ভালবাসতেন। রথ প্রতিযোগিতা, নাচগান, বাজি রেখে পাশা খেলায় ছিল তাঁদের আনন্দ। এঁদের খাদ্য ছিল শাক সবজি, ফলমূল, দই আর মধু। উৎসবের সময় তাঁরা মাংস খেতেন। সোমরস ও সুরা ছিল তাঁদের অতি প্রিয় পানীয়।

আর্যদের ধর্ম

আর্যরা বহু দেবদেবীর পূজা করতেন। সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, নক্ষত্র, আকাশ, বৃক্ষলতা, নদী, পর্বত প্রকৃতির যত শক্তি সব কিছুকেই, আর্যরা দেবতা বলে পূজা করতেন। **দৌঃ পিতর্** ছিলেন আকাশের দেবতা, **ইন্দ্র** ছিলেন ঝড়, বৃষ্টি, যুদ্ধের দেবতা; **সূর্য** সূর্যদেবতা, অগ্নির দেবতা **অগ্নি,** ভোরের দেবী **উষা**। দেবদেবীদের মানুষেরই মত আকৃতি কল্পনা করা হত।

আর্যদের বিশ্বাস ছিল যে পুরোহিত দিয়ে যাগযজ্ঞ করলে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে মানুষের উপকার করেন। সুতরাং বিরাট ব্যবস্থা করে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হত। মানুষের প্রার্থনা যাতে দেবতারা শুনতে পান সেজন্য পুরোহিতরা মন্ত্র পড়তেন। ক্রমে ক্রমে সেজন্য লোকের বিশ্বাস জন্মালো যে পুরোহিতরাই হলেন দেবতাদের ও মানুষের মধ্যে যোগাযোগের সেতু। পুরোহিত ব্রাহ্মণদের মর্যাদাও তার ফলে অনেক বাড়ল।

আর্যদের রাজনৈতিক সংগঠন

আর্যদের বিভিন্ন কুল এক এক অঞ্চল অধিকার করে বাস করতেন। তবে নিজেদের ক্ষমতা নিয়ে প্রায়ই বিভিন্ন কুলের মধ্যে মারামারি হত। মারামারির প্রধান কারণ ছিল পশুচারণের জমির দাবী। প্রত্যেক কুলের মধ্যেই সবচেয়ে বীর একজন নেতা বা রাজা ছিলেন। পরে রাজার পদ বংশগত হয়।

রাজাকে কুলের সকলের মতামত মেনে শাসন করতে হত। তাঁকে সাহায্য করার জন্য কয়েকজন রাজকর্মচারীও থাকতেন। একজন ছিলেন সৈন্যদলের অধিনায়ক **সেনানী**। তিনি সব সময় রাজার সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। আর একজন হলেন **পুরোহিত**। তাঁর কাজ ধর্ম কর্ম, যাগযজ্ঞ করা আর রাজাকে উপদেশ দান। দূরের গ্রামের লোকের সঙ্গে খবরাখবর দেওয়া-নেওয়ার জন্য ছিল দূত। তাঁর কুলের প্রধান মণ্ডল বা গ্রামনীর মতও রাজাকে মেনে চলতে হত। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলে কুলের সমস্ত লোকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হত। সেজন্য **সভা** ও **সমিতি** নামে দু'ধরনের ব্যবস্থা ছিল। সমিতিতে এসে যে-কেউ নিজের নিজের মত প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু সভায় শুধু বিশিষ্ট ও বয়স্করা যোগ দিতেন।

চতুর্থ পাঠ

দুইটি মহাকাব্য

আর্যরা বলতেন বেদের বাণী জনসাধারণের মধ্যে সহজভাবে প্রচার করার জন্য রামায়ণ আর মহাভারত মহাকাব্য দুটি রচিত হয়েছিল।

রামায়ণঃ সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বাল্মীকির রচনা। অযোধ্যার রাজা ছিলেন দশরথ। তাঁর চার ছেলে—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। রাম বড় বলে তাঁরই রাজা হবার কথা। কিন্তু বিমাতা কৈকেয়ীর চক্রান্তে রামকে চৌদ্দবছর বনবাসে কাটাতে হয়। বনবাসে রামের সঙ্গে যান স্ত্রী সীতা আর ছোট ভাই লক্ষ্মণ। নানা বনে ঘুরতে ঘুরতে রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যে পঞ্চবটী বনে আসেন। সেখানে লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান। হোমারের যুগের গ্রীসের মহাকাব্য ইলিয়াডেও এমনি এক রাণীকে হরণ করা নিয়ে ট্রয়ের কী ভীষণ যুদ্ধ বেধেছিল সে কথা মনে আছে তো? তখন রামচন্দ্র বানররাজ সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। বীর হনুমান সীতার সংবাদ নিয়ে এলে রামচন্দ্র বানর সেনা নিয়ে লঙ্কা আক্রমণ করে রাবণকে নিহত করেন। তারপর বিজয়ী বেশে তিনি দেশে ফিরে

এলে ভরত তাঁকে সিংহাসন দান করেন। শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে প্রজাদের সুখ শান্তির শেষ ছিল না।

রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে দিয়ে পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃভক্তি, পতিভক্তি প্রজাদের প্রতি রাজার কর্তব্য প্রভৃতি আর্য জীবনের নানা কথা আমরা জানতে পেরেছি। ভারতের প্রত্যেকটি ভাষাতেই সংস্কৃত রামায়ণ-এর অনুবাদ হয়েছে। শুধু ভারতবর্ষ নয় ভারতের বাইরের ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি স্থানেও রামায়ণের কাহিনী ছড়িয়ে আছে।

মহাভারত—মহর্ষি ব্যাসদেব অষ্টাদশ পর্বে ও একলক্ষ শ্লোকে মহাভারত রচনা করেন। বর্তমান দিল্লীর কাছে তখন হস্তিনাপুর নামে এক নগর ছিল। তার রাজা বিচিত্রবীর্যের দুই পুত্র ছিল। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলে পাণ্ডু রাজা হন। পাণ্ডুর পাঁচ ছেলে ও ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র। পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠির ও ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধন। দুর্যোধন হিংসা করে যুধিষ্ঠিরদের কপট পাশা খেলায় হারিয়ে বনবাসে পাঠান। বনবাস থেকে ফিরে এসে পাণ্ডবরা রাজ্য ফেরৎ চাইলে দুর্যোধন তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তা নিয়েই রচিত হয়েছে মহাভারত।

মহাভারতেও আর্য সমাজ ও রাজনীতির অনেক পরিচয় আছে। রামায়াণর মত মহাভারতও ভারতের সব ভাষাতেই অনুবাদ করা হয়েছে। ঘরে ঘরেই এ-দুটি মহাকাব্যের সমান আদর।

পঞ্চম পাঠ

ধর্ম বিপ্লব

আর্যদের বেদের ধর্ম ছিল যাগযজ্ঞ আর নানা আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে ভরা। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি তা পছন্দ করতেন না। বহু বিভিন্ন ধরনের ধর্মমত তখন প্রচারিত হচ্ছিল।

এইসব নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল লিচ্ছবী সাধারণতন্ত্রের মহাবীর বর্ধমানের জৈন ও শাক্য সাধারণ-তন্ত্রের গৌতমের বৌদ্ধ ধর্ম। ধর্ম আচার অনুষ্ঠান বর্জন করে

এঁরা সহজ সরল ধর্মের কথা বোঝালেন সবাইকে। প্রচলিত ব্রাহ্মণদের ধর্মের বিরুদ্ধে তাঁরা দাঁড়ালেন বলে একে বলা হয় **ধর্ম বিপ্লব**।

মহাবীর

উত্তর বিহারের মজঃফরপুর জেলার ভেতরে বৈশালী নগরের কাছে জ্ঞাতৃক নামে এক ক্ষত্রিয় বংশে মহাবীরের জন্ম হয়। ছেলেবেলায় তাঁর নাম ছিল **বর্ধমান**। তিরিশ বছর তিনি সংসারে ছিলেন। তারপর তিনি সংসার ত্যাগ করেন। একটানা বারো বছর নানা দেশে ঘুরে ঘুরে কঠোর তপস্যা করে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। বাহাত্তর বৎসর বয়সে পাবা নগরে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। মহাবীরের নতুন ধর্মের নাম **জৈন** ধর্ম ও তাঁর শিষ্যদের বলে জৈন।

মহাবীর

মহাবীর লোককে শেখালেন যে বেদের অত জাঁকজমক আর ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞের কোন প্রয়োজন নেই। অন্যায় না করে সৎ জীবন যাপনই হল মুক্তির শ্রেষ্ঠ পথ। সত্য বিশ্বাস, সত্যজ্ঞান আর সত্য কর্ম—এই ত্রিরত্নের উপর তাঁদের কাজের ফল নির্ভর করে। জীবে প্রেম তাঁর শিক্ষা। জীবহিংসা তিনি নিষিদ্ধ করেন। এরই নাম অহিংসা। মহাবীর সংস্কৃত ভাষায় না বলে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষায় নিজের মত প্রচার করতেন। তিনি জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন।

বুদ্ধের জীবনী ও বাণী

মহাবীরের নতুন ধর্মের কথা লোকের কানে যেতে না যেতে নেপালের পাদদেশের কপিলাবস্তুর শাক্য বংশের রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থ আর এক নতুন ধর্ম প্রচার করলেন।

তিনি ২৯ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করে সত্যজ্ঞান লাভের আশায় বহুদেশে কঠোর তপস্যা করলেন। অবশেষে একদিন পেলেন সত্যের সন্ধান। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি হলেন **বুদ্ধদেব**।

বুদ্ধদেব

তিনি সবাইকে শেখালেন যে জগত দুঃখময়। সে দুঃখের কারণ হল লোকের পার্থিব জিনিসের প্রতি আকর্ষণ। আটটি সত্য পথ ধরে চললে জীবনে দুঃখ থাকবে না। আটটি সত্য হল—সত্য-বিশ্বাস, সত্যসংস্কার, সত্যকার্য, সত্যপথে জীবন যাত্রা, সত্যচেষ্টা, সত্যচিন্তা এবং সত্যধ্যান ও সম্যক সমাধি। মানুষ সব সময় যদি এই আটটি পথ ধরে চলে তবেই তার মঙ্গল। মন পবিত্র করলে যখন কোনও কিছুর আকাঙ্ক্ষা থাকবে না তখন মানুষ নির্বাণ লাভ করবে।

বুদ্ধদেবও বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন। তিনিও জাতিভেদ মানতেন না। নানা স্থানে মঠ স্থাপন করে বুদ্ধদেব ধর্ম প্রচার করে ৮২ বৎসর বয়সে গোরক্ষপুর জেলার কুশীনগরে মহা-নির্বাণ লাভ করেন।

দেখতে না দেখতে কৃষক, কারিগর, ব্যবসায়ী ও শূদ্রদের মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকল। বৌদ্ধরা সুন্দর সুন্দর মঠ, বিহার, স্তূপ প্রভৃতি নির্মাণ করেন। এঁরাই ভারতের সংস্কৃতি সারা এশিয়া ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ষষ্ঠ পাঠ

মগধের অভ্যুত্থান

উপনিষদ ও ধর্ম বিপ্লবের যুগে ভারতে ষোলটি বড় বড় নগর বা মহাজনপদ ছিল। তার মধ্যে প্রধান ছিল কাশী, কোশল, মগধ ও বৃজ্জি। এই চারটি রাজ্যের মধ্যে প্রায় একশ বছর ধরে প্রতিযোগিতা চলে। অবশেষে মগধ সব থেকে প্রধান হয়ে ওঠে। **বিম্বিসারই** মগধকে সর্বপ্রথমে বিরাট রাজ্যে পরিণত করেন। তিনি বুদ্ধদেবের সময়ের লোক। তাঁর পরে পুত্র অজাতশত্রু মগধের সীমা আরও বাড়িয়ে নেন। তিনি পাটলিপুত্রে রাজধানী নির্মাণ করেন। পরবর্তী কালে **মহাপদ্মনন্দ** মগধের সীমানা পশ্চিমে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বাড়িয়েছিলেন। নন্দবংশেরই সৈন্যদলের বীরত্বের কাহিনী শুনে আলেকজান্দারের বাহিনী আর অগ্রসর হতে রাজী হয় নি।

মৌর্য সাম্রাজ্য

চন্দ্রগুপ্ত বিন্দুসার—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নামে এক তরুণ কৌটিল্য নামে কুটবুদ্ধি এক ব্রাহ্মণের সহায়তায় শেষ নন্দরাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি গ্রীকরাজা সেলুকাসকে পরাজিত করে নিজ রাজ্যের সীমানা বর্তমান আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তার করেন। তাঁর পুত্র বিন্দুসার এ সাম্রাজ্য আরও বাড়িয়েছিলেন। দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমানা তখন বিস্তৃত হয়। বাকী ছিল মাত্র কলিঙ্গ। এ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক।

সম্রাট অশোক

শুধু মৌর্য কেন—পৃথিবীর ইতিহাসেই সম্রাট অশোকের সঙ্গে আর কোনও সম্রাটের তুলনা চলে না। তিনি সিংহাসনে বসেই দেখলেন যে কলিঙ্গ জয় না করতে পারলে তাঁর সমুদ্র পথে বাণিজ্যের পথ সুগম হয় না। তাই তিনি জয় করেছিলেন কলিঙ্গ রাজ্য। এর পর তাঁর তিরিশ বছরের রাজত্বে তিনি আর কোনও যুদ্ধ করেননি। কলিঙ্গ জয় শেষ হলে এই সর্বপ্রথম সারা উত্তর ও

দক্ষিণ ভারত নিয়ে এক অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। সম্রাট অশোকের ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়েছে সারা ভারতে ছড়ানো তাঁর নানা শিলালিপি থেকে।
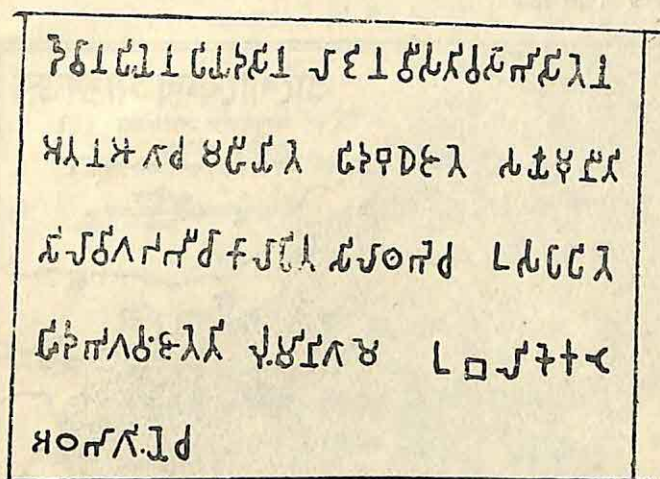
অশোকের ব্রাহ্মী শিলালিপি

অশোকের ধর্ম—কলিঙ্গ যুদ্ধের পরে সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সেই ধর্মের বাণী তিনি রাজ্যময় শিলালিপি দিয়ে প্রচার করলেন।

প্রিয়দর্শী অশোক

সম্রাট অশোকের সময় ভারতের সঙ্গে বৃহত্তর পৃথিবীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। ভারত থেকে সিরিয়া ও মিশর অবধি অশোক রাজপথ নির্মাণ করে সেদেশে ধর্ম প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশেও ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করেছিলেন।

একশ বছর মৌর্য সাম্রাজ্য টিকে ছিল। সম্রাটদের অকর্মণ্যতা শাসন ব্যবস্থার অবনতি প্রভৃতি নানা কারণে অবশেষে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

মৌর্য সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি কাল

ভারতে বিদেশী শাসক

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। দেশে কোনও শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন না। সেজন্য বিদেশ থেকে বহুজাতি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিল হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তরে বাহ্লীক

বা ব্যাক্ট্রিয়ার রাজ্যের গ্রীকগণ, তারপশ্চিমের পহ্লব বা পার্থিয়ানগণ এবং মধ্য এশিয়ার শকগণ। এর পরে হয়েছিল কুষাণ অভিযান।

কুষান বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন **কণিষ্ক**। তাঁর রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা বর্তমানের পেশোয়ার। কণিস্ক বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁর রাজসভা বহু পণ্ডিতের দ্বারা অলংকৃত হয়েছিল। তাঁর সময়ে বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছিল। তিনি ধর্ম প্রচারক পাঠিয়ে মধ্য এশিয়া ও চীনে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর রাজসভায় ছিলেন কবি **অশ্বঘোষ**, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকার **চরক** ও বিজ্ঞানী দার্শনিক নাগার্জুন।

গুপ্ত সাম্রাজ্য : ভারতের সুবর্ণ যুগ

ইউরোপে যখন রোমান সাম্রাজ্য তিন মহাদেশ জুড়ে **শান্তি ও** সমৃদ্ধি গড়ে তোলে, তখন ভারতে চলছিল গুপ্ত রাজবংশের রাজত্ব। এযুগে ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা এত মহান কৃতিত্ব অর্জন করে যে এযুগকে সকলে বলে **ভারতের স্বর্ণযুগ**।

সমুদ্রগুপ্ত : গুপ্ত বংশের প্রথম রাজার নাম **প্রথম চন্দ্রগুপ্ত**। তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্তই এ বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। সিংহাসনে বসে তিনি দিগ্বিজয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেন। এলাহাবাদের একটি খোদিত স্তম্ভের লিপি থেকে তাঁর **দিগ্বিজয়ের কাহিনী** জানা যায়। তাঁরই সভাকবি **হরিষেণ** এই লিপি খোদাই করেছেন। তিনি নিজে বীণা বাজাতেন। বীণা বাদ্যরত তাঁর অঙ্কিত অনেক মুদ্রা আছে। এসব মুদ্রা থেকেই তাঁর আকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

সমুদ্রগুপ্ত

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত : সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত করেন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। তিনি উজ্জয়িনীতে রাজধানী

প্রতিষ্ঠা করেন। পশ্চিম ভারতের শকদের তিনি দমন করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় **শকারি বিক্রমাদিত্য**। তাঁর রাজত্বকালে ফা-হিয়েন ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন।

গুপ্তবংশের পতন : দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পরে সিংহাসনে বসেন দুর্বল রাজারা। তখন চীনের হিউং নু বা হূনদের একটি শাখা বারংবার ভারত আক্রমণ করে। তাদের আক্রমণে গুপ্ত রাজত্বের অবসান ঘটে।

সপ্তম পাঠ

প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী

আর্যদের ভারতে আগমনের বহু পূর্ব থেকেই বাংলায় সুসভ্য জাতির বাস ছিল। প্রাচীন বাংলা একটা রাজ্য ছিল না। এখানেও নানা নগর রাজ্য গড়ে উঠেছিল। তাদের নাম **বঙ্গ**, **পুণ্ড্র**, **সুহ্ম**, **বরেন্দ্র**, **বঙ্গাল**, **চন্দ্রদ্বীপ**, গৌড়, রাঢ় ইত্যাদি।

আর্যদের সংস্পর্শ : বাংলা সম্বন্ধে আর্যভাষাভাষীদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের বহু পরের যুগের **ঐতরেয় ব্রাহ্মণ** ও **বৌধায়ন এবং ধর্মসূত্রে**। বাঙালীরা বেদের ধর্মকর্ম মানতেন না বলে আর্যরা এঁদের বলতেন **দস্যু** আর **অসুর**। মহাভারত ও রামায়ণের মধ্যে বাংলার রাজাদের নাম পাওয়া যায়।

জৈনদের ধর্মগ্রন্থ **প্রজ্ঞাপনা, আচারাঙ্গ সূত্র, ভগবতী সূত্রে** রাঢ় অঞ্চলের অনেক কথা আছে। জৈন মহাবীর রাঢ় অঞ্চলে এসে-ছিলেন। বুদ্ধদেবও নাকি বাংলায় এসেছিলেন সে কথা লেখা আছে বৌদ্ধগ্রন্থ **দিব্যাবদানে**। **জাতকের** গল্পে প্রাচীন বাংলার বন্দর **তাম্রলিপির** নাম আছে।

গ্রীক লেখকগণ গঙ্গারিড়ই নামে এক বীর জাতির উল্লেখ করেছেন। পদ্মা আর ভাগীরথীর মধ্যের অঞ্চলে ছিল এই গঙ্গারিড়ই। পরবর্তী কালে মৌর্য ও গুপ্তবংশের রাজত্ব চলেছিল বাংলায়। গুপ্তযুগে সারা বাংলা ছিল গুপ্ত রাজাদের অধীনে। তারপরে গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে আবার বাংলার জনপদগুলি

স্বাধীন হয়ে উঠেছিল। অবশেষে গুপ্ত সম্রাটদের সামন্ত রাজা শশাঙ্ক এক ঐক্যবদ্ধ বাংলা রাজ্য গড়েছিলেন।

বাঙালীরা কৃষিকাজ জানতেন, বেতে বাঁধা বালাম নৌকায় ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। নানা কুটিরশিল্পে তাঁরা ছিলেন পারদর্শী। তাঁদের ব্রতপার্বন আজও আমরা পালন করি। আমাদের বিয়ের সিঁন্দুর শঙ্খ সবই সেই যুগের স্মৃতি। বাঙালীদের নানা শিল্পকার্যের সুখ্যাতি বিদেশেও ছিল। অর্থশাস্ত্রে বাংলার রেশমশিল্পের বিশেষ উল্লেখ আছে। তাছাড়া বাংলার বিশেষত্ব ছিল হস্তী আয়ুর্বেদে।

অষ্টম পাঠ

বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বিষয় হল মধ্য ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার। খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেই মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি সভ্যতার এক বিশেষ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। ভারতের আচার ব্যবহার, ধর্ম, শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্য নানা ভাবে এই অঞ্চলের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল।

মধ্য এশিয়ার **খোটান** অঞ্চলে ভারতীয় বণিকদের অনেক উপনিবেশ ছিল। সে সব অঞ্চলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষারই প্রচলন ছিল। বৌদ্ধধর্মও সেখানে সাধারণের ধর্ম ছিল। খোটানের **গোমতিবিহার** বৌদ্ধ শস্ত্র আলোচনার একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল। ভারতে আসার পরে ফা-হিয়েন এই শিক্ষাকেন্দ্রে কিছুদিন ছিলেন।

সমুদ্রপথে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোচীন ও ইন্দো-নেশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। আসাম, কম্বোজ যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে বিশাল বিশাল হিন্দু, বৌদ্ধ মন্দির ও মঠ আছে।

বিদেশী যোগাযোগের ফলাফল

বিদেশী শাসকদের সময় ভারতের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ায় যোগাযোগ ঘটেছিল। তার ফলে ধম, শিল্পরীতি, জ্ঞান বিজ্ঞান ও

ভারতের জীবনধারায় নানা পরিবর্তন ঘটেছিল। ইরাণ ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হল। এতে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পেল। ভারতের পণ্যদ্রব্য ভূমধ্যসাগরের তীরের নানা নগর ও বন্দরে ছড়িয়ে পড়ল। নীলনদের মোহনার আলেকজান্দ্রিয়া নগর বহুদূরে অবস্থিত হলেও ভারতের পণ্য সেখানে প্রচুর রপ্তানি হত। ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে তক্ষশীলা, মথুরা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি নগরের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেলে তখন।

পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রীক ভাস্কর্যের প্রভাব দেখা দিল পশ্চিম ভারতের নগরগুলিতে। বুদ্ধদেবের মূর্তিগুলি দেখতে হলো গ্রীক দেবদেবীর মত। এই নূতন শিল্পরীতি গান্ধার অঞ্চলে প্রচলিত ছিল বলে তার নাম হয় **গান্ধার শিল্প**। পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের নানা অঞ্চলে এই শিল্পরীতির প্রচার ছিল। কিন্তু ঐ সময়ে মথুরাতে আর এক শিল্পীগোষ্ঠী যে ভাস্কর্য রচনা করেন তাতে কোনও গ্রীক প্রভাব ছিল না। সে শিল্পরীতির নাম হয় মথুরার শিল্পরীতি।

বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যেও এই সময় পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলে দুটি মত দেখা যায়—বুদ্ধদেবের মূর্তিপূজা বিরোধী হীনযান ও মূর্তিপূজা সমর্থক মহাযান। কণিষ্ক মহাযানী বৌদ্ধ ছিলেন বলে মহাযানী বৌদ্ধধর্ম প্রচারকদের চীনে পাঠান।

বিদেশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার আর একটি সুফল হল জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার প্রসার। এ যুগের উন্নতির ফলেই গুপ্তযুগে ভারতের স্বর্ণযুগের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল।

নবম পাঠ

ভারতে বিদেশী পর্যটক

প্রাচীনকালে দুজন বিদেশী ভারত ভ্রমণে এসে এদেশের জীবনের নানা কাহিনী লিখে গেছেন। তাদের একজন হলেন পশ্চিমের গ্রীস-দেশের **মেগাস্থিনিস**; আর একজন উত্তরের চীন দেশের **ফা-হিয়েন**।

মেগাস্থিনিস

মেগাস্থিনিস ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজদরবারে গ্রীক সম্রাট সেলুকাস নিকোটারের রাজদূত। এদেশে থাকবার সময় তিনি যা দেখেছিলেন তা **ইণ্ডিকা** নামে একটি গ্রন্থে লিখে যান। তবে সে গ্রন্থের অনেক অংশই হারিয়ে গেছে।

তিনি বলেন মৌর্যদের রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল এক বিরাট, রমণীয় নগর। রাজপ্রাসাদ পাথরে তৈরি; পারস্যের রাজপ্রাসাদের চেয়েও সুন্দর। রাজদরবারের ঐশ্বর্য ও রাজার বিলাসিতা দেখে মেগাস্থিনিস আশ্চর্য হয়ে যান।

তখনকার সমাজের বিষয়ে মেগাস্থিনিস লিখেছেন যে লোক-সংখ্যার অধিকাংশই ছিলেন কৃষক। তাঁতী, ছুঁতোর, কুমোর, কামার এইসব কারিগর নগরে বাস করতেন। ব্যবসা-বাণিজ্য তখন বেশ ভাল চলত; দেশের সর্বত্র পণ্য লেন-দেন হত। কৃষক ও কারিগরের তুলনায় ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ কি জৈন সাধুর সংখ্যা কম ছিল। তাঁরা রাজাকে কোন কর দিতেন না।

ফা-হিয়েন

বিদেশী শাসকদের যুগে ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্ম চীনে প্রচারিত হয়। ক্রমে ক্রমে চীনের ধর্মপিপাসুরা ভারতে এসে বৌদ্ধ ধর্মের বিষয়ে জানতে আগ্রহী হন। তাঁদেরই একজন ছিলেন **ফা-হিয়েন** ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গোবি মরুভূমি পার হয়ে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তিনি ভারতে এসেছিলেন। গুপ্তযুগের অনেক কথা তাঁর লেখা থেকে জানা যায়। তিনি লিখে গেছেন যে ভারতে তখন হিন্দু ও বৌদ্ধরা সুখে শান্তিতে বাস করতেন। ভারতের ধন ও ঐশ্বর্যের কথাও তিনি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। লোকজন ছিলেন সৎ। সকলেই আইন মেনে চলতেন। আইন খুব মৃদু ছিল; কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না। ফা-হিয়েনের মতে অধিকাংশ লোক ছিলেন নিরামিষাসী।

সমাজ বিভিন্ন জাতে বিভক্ত ছিল। তবে সকলেই সদ্ভাবে

বসবাস করতেন। নগরের প্রান্তে একদল অস্পৃশ্য থাকতেন। লোকে তাঁহাদের উপর ভাল ব্যবহার করতেন না।

তিনি বলেছেন যে প্রত্যেক বৎসরের দ্বিতীয় মাসের অষ্টম দিনে রাজধানীতে এক বিরাট ধর্ম শোভাযাত্রা বের হত। ২০।২৫ খানা ভাল করে সাজানো রথের উপর সমস্ত দেবমূর্তি বসিয়ে বাদ্য ভাণ্ড নিয়ে সারা রাজধানী ঘুরে বেড়ান হত। দেশের অন্যান্য নগরেও এরকম শোভাযাত্রা করা হত।

এক কথায় ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে গুপ্তযুগে ভারতের জীবন ছিল সুখী ও সমৃদ্ধ।

দশম পাঠ

ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতি

বেদের যুগ থেকেই ভারতে শিক্ষার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে গুপ্তযুগে তার চরম বিকাশ ঘটে।

শিক্ষা: বারাণসী, মথুরা, কাঞ্চী, নাসিক ইত্যাদি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। তক্ষশীলা প্রাচীন ভারতের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এখানেই জীবক চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেন। গুপ্ত সম্রাটগণ মুক্ত হস্তে নালন্দার উন্নতির জন্য দান করতেন। **নালন্দা** এবং **বলভীর** বিকাশ হয় পরে। গুপ্তযুগে সংস্কৃত সারা ভারতে প্রচলিত শিক্ষিতদের ভাষা হয়ে ওঠে।

সাহিত্য: বেদ উপনিষদ ও তার পরে কণিষ্কের যুগে অশ্বঘোষ প্রভৃতির সাহিত্য উল্লেখযোগ্য। পরে গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার কালিদাস। সমসাময়িক পৃথিবীতে তার মত মহাকবি আর কেউ ছিলেন না। তাঁর **অভিজ্ঞান শকুন্তলা, মেঘদূত, রঘুবংশ** ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। প্রাচীন নাট্যকারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন শূদ্রক ও বিশাখদত্ত। শূদ্রকের **মৃচ্ছকটি** অপূর্ব নাটক। বিশাখদত্তের **মুদ্রারাক্ষস** ও তেমনি। অমরসিংহ রচনা করলেন পৃথিবীর সর্বপ্রথম অভিধান **অমরকোষ**। আমরা যে সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত দেখি তা গুপ্তযুগে সংশোধিত হয়েছিল।

শিল্প ও স্থাপত্য : প্রাচীন ভারতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উন্নতি হয়েছিল। কুষাণ আমলের গান্ধার শিল্পের গ্রীক প্রভাব থেকে ভারতের শিল্পধারা পরে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। গুপ্ত সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে শিল্পরীতির সৃষ্টি হয় তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল ব্রহ্মদেশে, শ্যাম ও কাম্বোডিয়ায়।

সম্রাট অশোকের আমল থেকে সাধু সন্ন্যাসীদের আশ্রয়ের জন্য অজন্তা গুহাচিত্র রচনার আরম্ভ হয়। তার চরম পরিণতি ঘটে গুপ্ত-যুগে। সেসব চিত্রের অধিকাংশই বুদ্ধদেবের জীবনী নিয়ে। তাছাড়া

অজন্তা চিত্র মা ও ছেলে

ছিল জাতকের গল্প, আর সে যুগের সাধারণ মানুষের জীবন ও রাজরাজড়ার দরবার নিয়ে আঁকা।

বিজ্ঞান জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত : পুরাণ, সাহিত্য, কাব্য, নীতি শাস্ত্রের মত বিজ্ঞানেও প্রাচীনযুগে ভারতের অগ্রগতির তুলনা হয় না। ইতিপূর্বে বৈদিক যুগে যজ্ঞের বেদী নির্মাণ করতে গিয়ে আর্যগণ জ্যামিতি, পাটীগণিত, বীজগণিত ইত্যাদির চর্চায় দক্ষতা অর্জন করে ছিলেন। গণিতজ্ঞ **আর্যভট্ট** পাটলিপুত্রে ৪৭৬ খ্রীঃ

জন্মেছিলেন। হিন্দুদের ইতিপূর্বে যত বীজগণিত প্রচলিত ছিল তিনি তা সুসংবদ্ধ করে আরও উন্নত করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে প্রথম নয়টি সংখ্যা ও শূন্যের ব্যাখ্যা করেন। অঙ্কশাস্ত্রে ভারতের শ্রেষ্ঠ দান এই শূণ্যের জ্ঞান। হিন্দু জ্যোর্তিবিদরা ভাল ভাবেই জানতেন যে সৌর জগতের গ্রহগুলি বৃত্তাকার ও তাদের নিজেদের আলো নেই। পৃথিবীর আহ্নিক গতির জ্ঞান তাঁদের ছিল। ভারতের জ্যোতির্বিদদের দ্বিতীয় প্রতিভাধর হলেন বরাহমিহির। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রবিদও ছিলেন। স্থাপত্য, ধাতুবিদ্যা, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি এক বিশ্বকোষও রচনা করেছিলেন। তিনি গ্রীক বিজ্ঞানীদের দান অতিশ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন।

রসায়ন: রসায়নশাস্ত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের নানা দান আছে। পৃথিবীর মধ্যে তাঁরাই প্রথম দেহে ঔষধ হিসাবে পারদ ও গন্ধকের ব্যবহার করেন। পারদ ও লৌহার ব্যবহারের কথা বরাহমিহিরও উল্লেখ করেছেন। নাগার্জুন পাতন ও জারণ প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন।

চিকিৎসাশাস্ত্র: চিকিৎসাশাস্ত্রে সে যুগে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছিল। চরক ও শুশ্রুতের রচনা সংগ্রহ করে সে যুগে চিকিৎসা-শাস্ত্রের আরও উন্নতি হয়েছিল। আয়ুর্বেদের সঙ্গে সঙ্গে হস্তী চিকিৎসার বিষয়ও সে যুগের চিকিৎসাশাস্ত্রে আলোচিত হত। চিকিৎসা বিদ্যায় ভারতীয়রা এত উন্নত হয়েছিলেন যে, আধুনিক যুগেও অনেক দেশের চিকিৎসকরা যা পারেন না, সেই সূক্ষ্ম স্নায়ুর উপরও তাঁরা অক্লেশে অস্ত্রোপচার করতেন। ছাত্রদের কাঠের ছাঁচে ঢালা মোমের মূর্তি বানিয়ে অস্ত্রোপচার শিক্ষা দেওয়া হত।

প্রাচীন জগৎ (ষষ্ঠ শ্রেণী)

—গিরীন চক্রবর্তী

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়—১। **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্ন**—'ক' স্তম্ভের সহিত 'খ' স্তম্ভের বাক্যাংশগুলিকে মিলিয়ে লিখ :

ক স্তম্ভ	খ স্তম্ভ
(i) সভ্যতা হচ্ছে	অতীতকে জানবার একটা পথ
(ii) পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ	পাহাড়ের গায়ে বা পাথরে লেখা।
(iii) শিলালিপি হচ্ছে	মানুষের বিষয় যাঁরা আলোচনা করেন।
(iv) নৃতত্ত্ববিদ্ হচ্ছেন	মাটি খুঁড়ে যে সব জিনিস পাওয়া যায়।
(v) ইতিহাস পড়া	সুশৃঙ্খল সমাজের জীবন ধারা।

২. **মৌখিক প্রশ্ন**—(i) ইতিহাস পড়ব কেন ? (ii) রাজা বাদশাহ-দের শাসনের কথা কোথায় লেখা আছে ? (ii) পূর্বপুরুষেরা কি করে ইতিহাসের সূত্র রেখে গেছেন ? আমরা সুদূর অতীতের কথা জেনেছি কেমন করে ? ৩. **প্রবন্ধ ভিত্তিক প্রশ্ন**—(i) আমাদের কেন ইতিহাস পড়া উচিত সে বিষয়ে একটি ছোট্ট প্রবন্ধ রচনা কর। (ii) অতীতের ইতিহাস রচনায় প্রত্নতাত্ত্বিকরা কিভাবে সাহায্য করেন। উদাহরণসহ উত্তর লিখ। ৪. **যা করতে পারো**—ইতিহাসের জন্য একটি বড় খাতা বানাও। তাতে অতীতের খনন কার্যের দু-একটি বিষয়ের ছবি আঁকো। কাছে পুরাতত্ত্ব চর্চার স্থান থাকলে গুরুজনদের সঙ্গে গিয়ে দেখে এসো সেখানে কি কি আছে। সম্ভব হলে তার ছবিও তোমার সংগ্রহ খাতায় এটে রাখবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়—১. **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্ন**—সঠিক উত্তরটি লিখিয়া তাহার পাশে √ দিয়া দেখাও—(i) ভুল থাকিলে বাক্যটি লিখিয়া তাহার পাশে × চিহ্ন দাও :—

(i) আদিকালের মানুষ আমাদের মতই দেখিতে ছিল। (ii) প্রায় সোজা হয়ে দাঁড়ানো মানুষের নাম জাভা মানুষ। (iii) আদিম মানুষ সিদ্ধ মাংস খেত। (iv) আগুন আবিষ্কারের কৃতিত্ব চীনের মানুষের। (v) পুরা প্রস্তর যুগের মানুষ খাবার যোগাড়ে ছিল না। (vf) শেষ পুরাপ্রস্তর যুগে তীর ধনুক আবিষ্কৃত হয়। (vii) নবপ্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতি ছিল অমসৃণ। নব-প্রস্তর যুগে মানুষ খাদ্য উৎপাদন করতে শিখেছে। (viii) মানুষের প্রথম পোষ মানে গবাদি পশু। (ix) মাতৃকা দেবীর পূজা নবপ্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্য। (x) নবপ্রস্তর যুগে শ্রেণীভেদ ছিল না।

২. **মৌখিক প্রশ্ন**—(i) কতদিন আগে মানুষ আগুন আবিষ্কার করে ? কোথায় ? (ii) প্রস্তর যুগ কথাটা কেন বলা হয় ? (iii) নবপ্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতির বিশিষ্টতা কি ? (iv) কত বছর আগে নবপ্রস্তর যুগ আরম্ভ হয় ? (v) জুম চাষ কাকে বলে ? (vi) কোথাকার গুহায় বাইসনের জীবন্ত ছবি আছে ? (vii) প্রথম যুগে আর্যরা কি লিখতে জানতেন ? ৩. **প্রবন্ধ ভিত্তিক প্রশ্ন**—(i) পুরাপ্রস্তর যুগের মানুষের জীবন যাত্রা কেমন ছিল তার বিবরণ লিখ। (ii) নবপ্রস্তর যুগের বিপ্লবের প্রধান প্রধান উপকরণ কি কি ছিল ? (iii) "নবপ্রস্তর যুগের বিপ্লবের ফল সমাজজীবন গড়ে তোলা"— (iv) মাতৃকা দেবীর পূজা কেন করা হত ? সে বিষয়ে যা জানো লেখ। ৪. **যা করতে পারো**—পুরানো ইতিহাসের বই থেকে প্রাচীন কালের বিভিন্ন যুগের মানুষের ছবি সংগ্রহ করে ইতিহাসের খাতায় আঁটো। (ii) ছবি এঁকে আর লিখে যাযাবরদের জীবনযাত্রার বিষয় লেখ। (iii) ছবি থেকে মহেঞ্জোদড়োর প্রাচীন গাড়ির নমুনা দেখে ভাল করে গাড়ি এঁকে দেখো এখনকার গাড়ির সঙ্গে তার মিল কেমন ? (iv) নবপ্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্রের ছবি এঁকে রাখো।

তৃতীয় অধ্যায়—১. বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্ন—শূন্যস্থান পূর্ণ কর— (i) কৃষকরা — খাদ্য বিনিময় আরম্ভ করলেন। (ii) তাঁদের কাজের — করণ ঘটল। (ii) একটা জিনিসের বদলে অন্য জিনিস নেওয়াকে বলে —। (iv) রাজা আর — হলেন সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী। (v) মানুষ কৃষিকাজ শেখার পর থেকে — র আরম্ভ। ২. **মৌখিক প্রশ্ন**—(i) প্রস্তর যুগের শেষে মানুষ কোন্ যুগে পা দিলেন ? (ii) কাদের ঘিরে ধীরে ধীরে নগর গড়ে উঠল ? (iii) বিনিময় প্রথা সম্ভব হল কেমন করে ? (iv) সমাজে ধনী-দরিদ্রের ভেদ কেন হল ? (v) সমাজে সবচেয়ে শক্তিশালী হলেন কারা ? (vi) কোন্ কোন্ দেশের কোন্ কোন্ নদী-উপত্যকায় আদিম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ?

৩. **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্ন**—'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে পূর্ণ বাক্য লিখ :—

ক স্তম্ভ	খ স্তম্ভ
(i) পুরাপ্রস্তর যুগে	মানুষ করেছিল মসৃণ যন্ত্রপাতি, পশুপালন, কৃষি।
(ii) তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে	মানুষ তামা ও ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতি আর নগর সভ্যতা গড়েছিল

(iii) তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে   গাড়ির চাকা আবিষ্কারে সাহায্য করে।
(iv) কুমারের চাকা   আদিম রাষ্ট্র কাঠামোর সৃষ্টি হয়েছিল।
(v). নবপ্রস্তর যুগে   মানুষের ছিল অমসৃণ যন্ত্রপাতি আর যাযাবর জীবন।

৪. **প্রবন্ধ ভিত্তিক প্রশ্ন**—(i) গ্রাম থেকে মানুষ কিভাবে নগর প্রতিষ্ঠা করলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ কর। (ii) "নগর জীবন ক্রমেই জটিল হয়ে উঠল"—কি কি কারণে নগর জীবন জটিল হয়ে উঠেছিল তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা কর। (iii) সমাজে রাষ্ট্রের উৎপত্তি কিভাবে হল তার বিষয়ে যা জানো সংক্ষেপে লিখ। (iv) নদী উপত্যকায় আদি সভ্যতা গড়ে উঠার কারণ বিবৃত কর। ৫. **যা করতে পারো**—(i) ইতিহাসের খাতায় সুন্দর করে পৃথিবীর রেখা মানচিত্র এঁকে তার মধ্যে আদি সভ্যতার অঞ্চল-গুলিকে দেখাও। (ii) তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের যন্ত্রপাতি ও আবিষ্কৃত জিনিস-এর ছবি এঁকে রাখো। সেই সঙ্গে লিখে রাখো প্রস্তর যুগের সঙ্গে তাদের কি পার্থক্য।

চতুর্থ অধ্যায় ক,—**মেসোপটেমিয়া** : ১. **বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্ন** : সঠিক উত্তরটি লিখে √ দাও আর ভুল উত্তরটিতে × চিহ্ন বসাও :—(i) ৪০০০ বছর পূর্বে তাম্রব্রোঞ্জ যুগের আরম্ভ হয়েছিল ? (ii) পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা মেসোপটেমিয়ার সুমের সভ্যতা। (iii) মিশরের লিপি থেকে সুমের-এর লিপির জন্ম। (iv) সুমের-এর লোকেরা বন্যার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে জানত না। (v) সুমেরীয়দের কৃতিত্ব চিত্রলিপি। খ. **মিশর** : (vi) ধূসর বালির বুকে শ্যামল রেখাটির নাম সাহারা। (vii) মিশর নীলনদের দান। (viii) মিশরের প্রধান পুরোহিতের নাম ফেয়ারো। (ix) মিশরের কারিগরদের কাজের সুনাম ছিল। (x) মিশরের পিরামিড দেবতাদের মন্দির। গ. (xi) **সিন্ধু সভ্যতা**: হরপ্পা সভ্যতার লোকেরা লিখতে জানতেন না। (xii) মহেনজোদড়ো সুপরিকল্পিত নগর। (xiii) মহেনজো-দড়োর স্নানাগার অতি আধুনিক। (xiv) মহেনজোদড়োতে দেবমন্দির আছে। (xv) হরপ্পা সংস্কৃতির লিপির পাঠোদ্ধার হয়েছে। ঘ. **হোয়াংহোর সভ্যতা** : (xvi) চীনে প্রথম সভ্যতার উদয় হয়েছিল ইয়াং সী কিয়াং উপত্যকায়। (xvii) চীনের ব্রোঞ্জযুগের রাজবংশের নাম সাং বা ইন্। (xviii) চীনের প্রথম মানুষ পানকু। (xix) চীনের লিপি কচ্ছপের খোলার দাগ থেকে আবিষ্কৃত হয়। ঙ. **সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য** : (xx) সভ্যতার

অঞ্চলগুলিতে জীবন সংগ্রামের মিল ছিল না। (xxi) সভ্যতার অঞ্চলের অর্থনীতির ভিত্তি ছিল কৃষি। (xxii) সব সভ্যতার অঞ্চলেই রাষ্ট্র গড়ে ওঠে নি।

২. **মৌখিক প্রশ্ন :** ক. **মেসোপটেমিয়া :** (i) মেসোপটেমিয়া কথাটির অর্থ কি? (ii) কোন্ কোন্ সভ্যতা মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার পরিচয় বয়ে বেড়াচ্ছে? (iii) সুমেরীয়দের কৃতিত্বের দুএকটি বলো তো। খ. **মিশর :** (iv) মিশর কোন নদীর পাশের দেশ? (v) মিশরের রাজার উপাধি কি? (vi) মিশরে সপ্তম আশ্চর্যের কি আছে? (vii) কোন্ মন্দিরের কোন্ দেবতার পুরোহিতের ক্ষমতা খুব বেশী ছিল? গ. **সিন্ধু উপত্যকা :** (viii) মহেনজোদড়ো কে আবিষ্কার করেন? (ix) মহেনজো-দড়োর সরকারী অফিস কোথায় ছিল? (x) সীলমোহর দিয়ে কী হত? ঘ. **চীনের সভ্যতা :** (xi) চীনের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল কোথায়? (xii) কি থেকে কালক্রমে চীনের লিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল? (xiii) চীনে উৎপাদনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ কি ছিল? ঙ. **সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য :** (xiv) নদীমার্তৃক সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে কী রকম ধর্মচেতনা দেখা দিয়েছিল?

৩. **প্রবন্ধভিত্তিক প্রশ্ন : মেসোপটেমিয়ার** (i) সুমেরীয় সভ্যতা কাকে বলে? সুমেরীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে যা জান লিখ। (ii) বন্যার হাত থেকে সুমেরবাসীরা কেমন করে আত্মরক্ষা করেন? বন্যা সম্বন্ধে কি কিম্বদন্তী জান? **মিশর :** মিশরের ফেয়ারো কে? তাঁদের সম্বন্ধে কি জান? তাঁদের স্মৃতি কিভাবে রক্ষিত হয়? (iv) মিশরের সরকারী কর্মচারী কারা? তাঁদের কাজকর্ম সম্বন্ধে যা জানো সংক্ষেপে লিখ। (v) মিশরের পিরামিড নিয়ে একটি ছোট প্রবন্ধ লেখ। **সিন্ধু সভ্যতা :** (vi) সিন্ধু সভ্যতার ক্ষেত্র খনন করে যেসব জিনিস পাওয়া গেছে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ কর। (vii) মহেনজোদড়ো হরপ্পার নগর পরিকল্পনার পরিচয় দাও। (viii) সিন্ধু সভ্যতার ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ে ছোট্ট প্রবন্ধ লেখ। **হোয়াংহো সভ্যতা :** (xi) চীনের প্রাচীন জীবনের পারচয় দাও। (x) চীনের দু-একটি উপকথার বর্ণনা দাও।

৪. **যা করতে পারো :** ১. বিভিন্ন অঞ্চলের সভ্যতার পূর্ণ পৃষ্ঠা ম্যাপ এঁকে তাতে স্থানগুলি দেখাও। ২. সিন্ধু সভ্যতার জীবন যাত্রায় যে ছবি আছে তা দেখে সেখানের দৈনন্দিন জীবনের একটি কাহিনী লিখ। ৩. মেসো-

পটেমিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের বন্যার কিম্বদন্তীর মত আমাদের দেশে কোন কিম্বদন্তী আছে কিনা তা জেনে ইতিহাসের পাতায় লেখ।

পঞ্চম অধ্যায় ১. প্রথম ভাগ—বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্ন : (i) ব্র্যাকেটের অন্তর্গত শুদ্ধ শব্দ নিয়ে বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূর্ণ কর : (i) খ্রীঃ পূঃ ২৯০০ থেকে ১৫০০ বছরের মধ্যে মিশরে, মেসোপটেমিয়ার, বিরাট রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে—(লৌহ/তাম্র-ব্রোঞ্জ) আবিষ্কারের ফলে। (ii) বাবিলন ছিল—(ফেয়ারো/পুরোহিতের) নগর রাষ্ট্র। (iii) হাম্বুরাবি বিধান লাভ করেন—(সূর্যদেব/আমন রে-র) কাছ থেকে। (iv) মিশরের সাম্রাজ্য বিস্তার করেন—(প্রথম/তৃতীয় থুটমোস)। (v) বাহিস্তান পাহাড়ের গায়ে বিজয় কাহিনী লিখেছিলো—(প্রথম দারিয়ুস/জারেক্সস /। (vi) ইহুদীদের মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন—(অ্যাব্রাহম/মোজেজ)।

২. **মৌখিক প্রশ্ন :** (i) কোন্ জাতি প্রায় লৌহ আবিষ্কার করেন? (ii) লৌহ যুগের সমাজ কেমন ছিল? (iii) বাবিলনের মন্দিরগুলি কেমন? (iv) নেবুক ডনেজার কে ছিলেন? (v) বাবিলনের গণনার একক ছিল কত? (vi) হাম্বুরাবির বিধানে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কিসের উপর? (vii) মিশরের কয়েকটি উপনিবেশের নাম কর। (viii) মিশরের দিগ্বিজয়ী সম্রাট কে ছিলেন? (ix) ভারতের পশ্চিমের পারস্য অধিকৃত প্রদেশের নাম কি ছিল? (x) জরথুষ্ট্রের মতে জ্ঞানের দেবতার নাম কি?

৩. **প্রবন্ধ ভিত্তিক প্রশ্ন :** (i) লৌহ যুগের সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য কি লিখ। (ii) হাম্বুরাবির বিধানে বাবিলনের যে সমাজচিত্রের পরিচয় পাও তার বিবরণ দাও। (iii) নতুন সাম্রাজ্যের যুগে মিশরের পুরোহিত তন্ত্রের বিবরণ লিখ। (iv) কাইরাস ও দারিয়ুসের সময়ে পারস্যের অভ্যুত্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ কর। (v) জরাথুষ্ট্রের জীবনী ও বাণী বিষয়ে যা জান লিখ। (vi) ইহুদীদের মুক্তিযাত্রা লইয়া ছোট্ট প্রবন্ধ লিখ।

৪. **যা করা যায় :** (i) বই-এর ছবি থেকে ব্যাবিলনের সমাজজীবনের একটি পরিচয় ইতিহাসের খাতায় লিখ। (ii) জারেক্সেসের সমুদ্রপারের চিত্রটি খাতায় এঁকে রাখো।

পঞ্চম অধ্যায় : দ্বিতীয় ভাগ—১. বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্ন : শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—(i) তারপর একদিন — ক্রীটের সভ্যতা ধ্বংস করে।

(ii) ইলিয়াড মহাকাব্য রচনা করেন —। (iii) এথেন্সের মাঝখানে — নামে সুন্দর জায়গায় বাজার বসত। (iv) ফিডিয়াস ছাড়া ছিলেন —। (v) — কে ইতিহাসের জনক বলা হয়। ২. **মৌখিক প্রশ্ন :** (i) কোন্ সভ্যতার মধ্যে দিয়ে গ্রীসে ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা প্রবেশ করেছিল ? (ii) গ্রীকরা কাকে গণতন্ত্র বলতেন ? (iii) গ্রীসের কোন নগররাষ্ট্র সংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠ ছিল ? (iv) স্পার্টা কেন বিখ্যাত ? (v) গ্রাসের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের নাম কর। তাঁর মৃত্যু কেমন করে হয়েছিল ? ৩. **প্রবন্ধভিত্তিক প্রশ্ন :** (i) গ্রীসের সভ্যতার উপর ক্রীটের প্রভাবের পরিচয় দাও। (ii) গ্রীক নগররাষ্ট্রের কাহিনীর বিষয় যা জানো লিখ ; (iii) এথেন্স ও স্পার্টার সমাজজীবনের তুলনামূলক পরিচয় দাও। (iv) সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এথেন্সের শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ লিপিবদ্ধ কর। (v) আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের বিবরণ লিখ। ৪. **যা করতে পারো :** (i) গ্রীসের মনীষীদের ছবি এঁকে ইতিহাসের খাতায় তাঁদের সুন্দর জীবনী লিখে রাখো।

তৃতীয় ভাগ : ১. বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্ন : শুদ্ধ বাক্যগুলি লিখিয়া ✓ দিয়ে দেখাও ; ভুলগুলি লিখিয়া তার পাশে × চিহ্ন বসাও :—(i) রোমের আদিম অধিবাসীরাই রোম নগরীর পত্তন করেন। (ii) কার্থেজ ছিল গ্রীকদের উপনিবেশ। (iii) প্যাট্রিসিয়ানরা ছিলেন আদি রোমানদের বংশধর। (iv) দাস বিদ্রোহের বিজয়ী ছিলেন স্পার্টাকাস। ২. **মৌখিক প্রশ্ন :** (i) রোমের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি ? (ii) ১৯৬০ সালের অলিম্পিকে যে সব বাঙালী খেলোয়াড় গিয়েছিলেন তাঁরা সর্বত্র দেখেন এক বাঘিনী মার দুধ খাচ্ছে এক শিশু—তার ছবি। এ বিষয়ে তুমি কি জানো ? (iii) রোম-কার্থেজের যুদ্ধের নাম কি ? (iv) রোম সাধারণতন্ত্রকে ধ্বংসের হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন তাঁর নাম কি ? (v) কোন্ সম্রাটের সময় রোমান সাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত হয় ? (vi) রোমে দর্শনীয় দুটি জিনিসের নাম কর। (vii) গ্ল্যাডিয়েটার কাকে বলে ? ৩. **প্রবন্ধভিত্তিক প্রশ্ন :** (i) রোম ও কার্থেজের সংগ্রামের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখ। (ii) প্রথম যুগের রোমান সমাজে প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের সম্পর্কের পরিচয় দাও। (iii) দাসত্ব ও দাস বিদ্রোহ বিষয়ে যা জানো সংক্ষেপে লিখ। (iv) নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় জুলিয়াস সীজারের ভাইপোর কৃতিত্ব বিচার কর। (v) যীশুখ্রীষ্টের জীবন ও বাণী বিষয়ে সংক্ষেপে লিখ। ৪. **যা করতে পার :** (i) জুলিয়াস

সীজারের নামে সেক্সপীয়রের নাটকের বাংলা অনুবাদ পড়ো। (ii) দাস জীবনের দুঃখের কথা ছবি এঁকে ইতিহাসের খাতায় লেখো।

চতুর্থ ভাগ : ১. বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্ন : ব্র্যাকেটের মধ্যের শুদ্ধ উত্তরটি দিয়া শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—(i) মহান সাং ছিলেন—যুগের সম্রাট (লৌহ/ব্রোঞ্জ) (ii) কনফুসিয়াস ছিলেন—(মহাবীরের / সাংযুগের) লোক। (iii) চীনের প্রাচীর নির্মাণ করেন—(সীইয়াংতী/পানকু)।

২. মৌখিক প্রশ্ন : (i) মহান সাংনাম হয়েছিল কেন? (ii) কনফুসিয়াস নামটির অর্থ কি ? (iii) চীন সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করেন কে ? **৩. প্রবন্ধ ভিত্তিক প্রশ্ন :** (i) মহান সাং সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লিখ। (ii) কনফুসিয়াসের জীবনী ও বাণীর বিবরণ দাও। (iii) চীনের বিরাট প্রাচীর নির্মাণের কাহিনীটি বিবৃত কর। **৪. যা করতে পার** (i) চীনের বিরাট প্রাচীরের ছবি ইতিহাস খাতায় আঁকো আর তার নির্মাণের কাহিনী লিখ।

পঞ্চম ভাগ : ১. বিষয়াশ্রয়ী প্রশ্ন : শুদ্ধ বাক্যগুলি লিখে ✓ চিহ্ন দাও আর ভুলগুলি লিখে তার পাশে × চিহ্ন বসাও : (i) আর্যগণ ভারতে আসার আগে ইরাণে বাস করতেন। (ii) আর্যদের ইতিহাস আমরা খনন কার্যের ফলে জেনেছি (iii) রামায়ণ রচনা করেন মহর্ষি ব্যাসদেব (iv) আর্যদের সমাজে চতুর্বর্ণ প্রথা ছিল। (v) ঋগ্বেদ দেবতাদের স্তবস্তোত্র নিয়ে লেখা (vi) মহাবীরের মৃত্যু হয় পাবা নগরে। (vii) আলেকজাণ্ডার বিম্বিসারের সৈন্যবলের কথা শুনে ফিরে যান। (vii) গুপ্তযুগে কালাগুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। (viii) বৈদেশিক শাসনকালে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। (ix) ফাহিয়েন সম্রাট অশোকের যুগে ভারতে এসেছিলেন। **২. মৌখিক প্রশ্ন :** (i) আর্যদের বেদ লিখিত না মুখে মুখে বলা ? (ii) খুব জটিল বিষয় নিয়ে আর্যসমাজের রাজা কাদের সঙ্গে আলাপ করতেন ? (iii) কণিষ্কের সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল ? (iv) প্রাচীন বাংলার-জীবন কেমন ছিল ? (v) মধ্য এশিয়ার কোথায় ভারতীয় সভ্যতার পরিচয় বেশী পাওয়া যায় ? (vi) মেগাস্থিনিসের গ্রন্থের নাম কি ? (vii) গণিত শাস্ত্রে ভারতের শ্রেষ্ঠ দান কি ? **৩. প্রবন্ধভিত্তিক প্রশ্ন :** (i) আর্যসমাজের

রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় দাও। (ii) মৌর্যযুগে ভারতের ইতিহাসের পরিচয় দাও (iii) বাংলার অতীত ইতিহাস সংক্ষেপে লিখ। (iv) মেগাস্থিনিসের বিবরণে ভারতের কি পরিচয় পাওয়া যায়? (v) মেগাস্থিনিসের সঙ্গে ফাহিয়েনের বিবরণের কি পার্থক্য আছে? (vi) ভারতের বিজ্ঞান বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দাও। ৪. **যা করতে পারো** (i) বেদের জীবনের ছবি এঁকে রাখো ইতিহাসের খাতায়। (ii) মৌর্য, কুষাণ ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের ম্যাপ এঁকে রাখো ইতিহাসের খাতায়।

———